STABAK BY MAITREYEE DEVI

ওঁ

কল্যাণীয়া শ্রীমতী মৈত্রেয়ী —

শুকতারকার প্রথম প্রদীপ হাতে
সকল আকাশ জাগালো ভোরের রাতে
আমি এসেছিনু উদয় তোরণে তোমারে জাগাব বলে
তরুণ আলোর কোলে, —
যে জাগায় জাগে পূজার শঙ্খধ্বনি,
বনের ছায়ায় লাগায় পরশমণি,
যে জাগায় মোছে ধরার মনের কালী,
অসীমের কাছে মুক্ত করে সে পূর্ণ মাধুরী ডালি ॥

জাগো সুন্দর, জাগো নির্মল,
জাগো আনন্দময়ী,
জাগো দুঃখজয়ী।
রুধিয়া তোমার দ্বার
বন্দী করিয়া রেখোনা রেখোনা
রাতের অন্ধকার।
বহুক উদার বায়ু,
শিরায় শিরায় রক্তে তোমার
দুলুক অমিত আয়ু।
নিখিললক্ষ্মী পাদপীঠতলে
আপনারে করো দান,
তোমার জীবন সার্থক হোক
কবির এ আহ্বান ॥

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দৌহিত্র শ্রীমান জ্যোতিষ্ক দাশগুপ্তকে—

যা কিছু নড়বড়ে আর খটখটে
যা কিছু ঝরঝরে আর মটমটে
যা কিছু বাঁকাচোরা তেভঙ্গা
ছেঁড়া খোঁড়া ফুটো ফাটা বেরঙা
সব রেখেছি ঢাকনা চাপা দিয়ে
ফেলতে পারি সাধ্য আছে কি এ।
তবু জানি আমার এ সংসার
যাবে না সেই বৈতরণীর পার।
নাতি এসে ঢাকনা করে ফাঁক
মুচকি হেসে লাগাবে হাঁক ডাক
শুকনো রঙের বোতল ধরে টান
কাসুন্দি আর তেলের শিশি চৌচির খান খান।
লুকিয়ে রাখা চিঠিগুলি খুলে
কেদারাতে হেলান দিয়ে ঈষৎ কৌতুহলে
সিগারেটের সুগন্ধে সৌখিন
মিলবে আমার হারিয়ে যাওয়া দিন।
একটু স্নেহ হয়ত বা কোন স্মৃতি রোমন্থিত
তেলের রঙের ছবি করবে দেওয়ালে লম্বিত
দু'চার দিনে ফ্রেমের নিচের কাপড় আঁটা পিঠে
বাসা করবে বুভুক্ষু সব ছোট্ট ছোট্ট কীটে
রঙের ভোজে ছবি হবে কীটদষ্ট ছায়া
দ্বৈতাদ্বৈতর টানে বোনা মিলিয়ে যাওয়া মায়া।

পুরানো ভূমিকা

কল্যাণীয়া মৈত্রেয়ীর বয়স বেশি নয়। কিন্তু তাঁর লেখা কবিতা প্রথম যখন আমার গোচরে আসে তখন তার বয়স, ছন্দের পথে লেখনী চালানর পক্ষে, আরো অল্প। পড়ে মনে হল বয়সের চেয়ে লেখা অনেকটা এগিয়ে চলেছে। স্বাভাবিক শক্তির আভাস পাওয়া গেল। কবিতাগুলি বয়সের হিসাবে নিপুণ তবু সাহিত্যের নিত্য আদর্শের পক্ষে কাঁচা। আমার মতে সেটা দোষের নয়, কাঁচা থাকাটাই স্বাস্থ্যের লক্ষণ। যতদিন বাড়বার বয়স থাকে ততদিন হাড় থাকে নরম; সেটা কঠিন হলে বাড় বন্ধ হয়ে যায়। তেমনি লেখবার শক্তি থাকলেও অল্প বয়সের লেখার মধ্যে ভাবী বিকাশের যথেষ্ট অপেক্ষা থাকা আশ্বাসের বিষয়।

আমাকে তার খাতা দেখতে দেওয়া হয়েছিল। আমি খুব বেশি ইস্কুল মাস্টারি করিনি। মাঝে মাঝে ছন্দে মিলে শৈথিল্য ছিল, সেইগুলি নিয়ে বালিকাকে কিছু উপদেশ দিয়েছিলুম। তখনি লক্ষ করেছিলুম মৈত্রেয়ীর মনের মধ্যে প্রকাশযোগ্য ভাবগুলি মুকুলিত হয়ে উঠছে। সেটা বিস্ময়ের বিষয়।

অল্প বয়সে মন বাইরের জিনিস ছুঁয়ে ছুঁয়ে বেড়াতেই ব্যস্ত থাকে। তখন খাপছাড়া অভিজ্ঞতাগুলিকে মিলিয়ে নিয়ে রূপদান করবার মতো ধ্যানশক্তি থাকে না। কারো কারো যদি বা থাকে কিন্তু সেটাকে আবার বাইরেকার উপকরণে প্রতিফলিত করবার প্রবর্তনা দৈবাৎ দেখা যায়।

মৈত্রেয়ীর সেই প্রথম খাতা দেখবার পরে মাঝে মাঝে সাময়িক পত্রে তার কবিতা আমার চোখে পড়ল। তার মধ্যে যে পরিণতির চেহারা দেখেছি সেটা আমি প্রত্যাশা করি নি। এর পরে আরো দুই একবার তার খাতা আমার হাতে এসেছে। কিন্তু এখন থেকে তার লেখা নিয়ে তাকে অধিক কিছু বলি নি। দেখলুম লেখিকার মন কাব্যের পথে চলতে শুরু করেছে, চলতে চলতে সে আপনার বিশেষ পথ আপনিই তৈরি করবে এই আমার বিশ্বাস। বাইরে থেকে তার সমালোচনা করা যেন সদ্য উন্মুখ অঙ্কুরকে ক্ষণে ক্ষণে শিকড়

নাড়া দিয়ে উৎপাত করা। যা প্রাণের নিয়মে আপনি বেড়ে উঠছে তাকে বাইরে থেকে তাড়া দেওয়া ভুল।

কিছুকাল থেকে তার লেখায় একটি যে লক্ষণ দেখা দিয়েছে সেটা তার এ বয়সের পক্ষে একেবারেই অনপেক্ষিত। ভাবের ছবি মনে অল্প বয়সেও রচিত হতে পারে কিন্তু তত্ত্বের গাঁথুনি তো তেমন সহজ নয়। কাব্যের মধ্যে তত্ত্বের উঁকি ঝুঁকি চলে, কিন্তু তাকে ডাক দিয়ে ভিতরে নিয়ে আশা প্রায় দেখতে পাওয়া যায় না। যদিবা এখন ঘটে, মৈত্রেয়ীর বয়সে সেটা আশ্চর্যের কথা। জ্ঞানের পথে যে উপলব্ধি সেটা তো পরিণত বয়সের অপেক্ষা রাখে বলেই জানি। শুধু চিন্তা করা নয়, চিন্তা করতে রস না পেলে সেটা কাব্যের বিষয় হতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যে ক্রমে তত্ত্বের আনন্দই যদি প্রধান হয়ে ওঠে তবে এ সম্বন্ধে তার রচনার অনন্যপূর্বতা বঙ্গসাহিত্যে একটি বিশেষ স্থান নিতে পারবে। *

পূর্বেই বলেছি রচনার প্রথম অবস্থায় বাইরের দৃষ্টি বাইরের নিন্দা প্রশংসা থেকে তাকে রক্ষা করা রচয়িতার মনের পক্ষে স্বাস্থ্যকর বলে বিশ্বাস করি। যখন কালক্রমে রচনার স্বকীয় সহজ ধারায় লেখকের চিত্ত নিঃসংশয়ে প্রবৃত্ত হয় তারপরে তার উপর নিজের চিন্তা ও পরের চিন্তার আঘাত তাকে আর বিক্ষিপ্ত করতে পারে না। মৈত্রেয়ীর কাব্যগুলিকে এখনি সাহিত্যের প্রকাশ্য সভায় ভিড়ের মধ্যে উপস্থিত করা ভালো হল কি না জানিনে। একথা আমি তার কাব্যের দিক থেকে বলছি নে, তার নিজের দিক থেকে বলছি।

আমার মুখে এমন কথা সঙ্গত হল কি না এ তর্ক উঠতে পারে; আমিও কাঁচা লেখা কাঁচা বয়সেই প্রকাশ করেছি; প্রকৃতি কাঁচা ফলকে শক্ত করে রাখেন, কৌতুহলের চক্ষু তাকে ভেদ করতে বাধা পায়। কিন্তু সাহিত্যের আমদরবারের দিনে ছাপাখানার দৌত্যগুণে আজকাল কোনো লেখাকেই উপযুক্ত লগ্নের অপেক্ষা করতে হয় না। ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে ঢুকে পড়া চলে, পরিচয়ের টিকিট দেখাতে হয় না। সেকালে বাংলা সাহিত্যের আসরে এত ভিড় ছিল না জায়গা ছিল ফাঁকা, কিন্তু তবু বাইরে নিষেধ না থাকলেও ভিতরে কালের পাহারা একটা থাকে। সেই মহাকালের নন্দী নিশ্চয়ই তর্জনী তুলেছিল।

---

* এ পর্যন্ত 'উদিতা'র প্রকাশিত ভূমিকা

ভাগ্যক্রমে তখনকার বিচারকদের কাছে আমি প্রশ্রয় পাইনি। আমার লেখার অস্পষ্টতা অপরিণতি প্রভৃতি নানা দোষ নিয়ে আমাকে লাস্ট্ বেঞ্চিতে বসিয়ে রাখা হয়েছিল। বিচারে ভুল হয়েছিল আমি এ কথা বলি নে। লাস্ট বেঞ্চিতে অবহেলা-রচিত অবকাশের অভাব থাকে না। সেইখানে বসে বসে আমি আপন লেখার ছাঁদ আপনি বানিয়েছি। কিন্তু মনে আজও অনুশোচনা আছে যে, যার নেপথ্য বিধান সারা হয়নি তাকে রঙ্গমঞ্চের হাজার আলোর সামনে দাঁড় করানো হল, ভালো হল না। সে আজ শুভ্র কাগজের উপরে কালির নৃত্যে যোগ দিয়েছে, তাকে থামানো যায় না, আড়াল করা অসম্ভব।

লোকের সামনে বসে লেখাও চলে লোককে যদি একেবারে ভুলে থাকবার ক্ষমতা থাকে। আমাদের বাল্যকালে সেটা তত দুরূহ ছিল না। তখন বিচারকদের রায় বেরোত উদার খাগড়া কলমের মুখে। তার রক্তপাত করবার মতো ধার ছিল না। আর রচনার ত্রুটি যে অক্ষমতার ত্রুটি, সেটা যে নৈতিক অপরাধ নয়, এই মত বোধ করি তখনকার ভদ্র সমাজে প্রচলিত ছিল। মূল্য বিচার দেওয়ানি আদালতে, আর অপরাধ বিচার ফৌজদারিতে। একটাতে সম্পত্তিগত অধিকার নির্ণয় আর একটাতে ব্যক্তিগত চরিত্র নির্ণয়। সাহিত্যে আজকাল সিভিল কোড প্রায় ব্যবহারে আসে না, সমস্তই দেখি পুলিস কেস্। যাদের হাড় পাকা, লাল পাগড়ি কনিষ্ঠবলদের অপমান তারাই সইতে পারে। সাহিত্য রচনায় যারা প্রথম প্রবৃত্ত, যাদের বয়স নিতান্তই অল্প সেই সুকুমার জীবদের কি এমন ক্ষেত্রে উপস্থিত করা ভালো যেখানে অনুচিত অসম্মান করবার রূঢ় প্রবৃত্তি নিঃসঙ্কোচ, এমন কি, সাধারণের রুচিকর? যেখানে নন্-ভায়েলেন্সের নীতি উপহসিত? আজকের দিনের এই নৃশংস সাহিত্য-বিচারের এলাকায় আমি যদি রচনায় প্রথম প্রবৃত্ত হতুম তাহলে সে রচনার অপঘাত মৃত্যু হতে বিলম্ব হত না এই আমার বিশ্বাস। ষোলো বছর বয়সের অভিমন্যুকে যুধিষ্ঠির সপ্তরথীর ব্যূহের মধ্যে পাঠিয়েছিলেন, এটি অবিবেচনার কাজ হয়েছিল তা সপ্রমাণ হয়েছে। আমার সেই কথাই মনে পড়ছে যখন দেখছি বাণ-বর্ষণ-মুখর সাহিত্য ক্ষেত্রে বালিকার রচনাকে এগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, সে রচনায় শক্তির লক্ষণ যতই থাক্!

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৬শে নভেম্বর, ১৯২৯
শান্তিনিকেতন

নিবেদন

দীর্ঘদিন পরে কবিতার বই প্রকাশ করবার দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হয়েছি। এর মধ্যে দুঃসাহস ও স্পর্ধা দুইই আছে। দুঃসাহস একারণে যে বর্তমান যুগের কবিতার প্রচলিত বাক্যভঙ্গী আমার আয়ত্ত নয়, যে ভাষার আশ্রয়ে আমার প্রতিদিনের জীবন চিন্তা চলে সেই ভাষাই আমার কবিতার ধারক। এই সর্বজনবোধ্য ভাষা বর্তমানে যুগের কবিতায় ধিক্কৃত। হয়ত তার যুক্তিসঙ্গত কারণও আছে। সদাসর্বদা ব্যবহারে ভাষা হয়ে যায় ঘসা পয়সার মত, তার ব্যবহার চলে, কিন্তু কারবারি হাতে নিয়ে খুশি হয় না, তার যে জৌলস নেই। সেই জন্য লেখক ভাষাকে ভেঙেচুরে নানা বঙ্কিম পথে বারবারই নূতন আকৃতি দিতে চান। কবিতার বিষয়বস্তু যাই হোক কবিতার স্থাপত্যে এমন প্রচুর পরীক্ষা নিরীক্ষা বাংলা দেশে আর কোনো এক যুগে ঘটেছে কি না জানি না। মনে হয় রবীন্দ্রনাথই এর মূল কারণ। ওই রকম আকাশস্পর্শী কালান্তরব্যাপী প্রতিভার পাশে স্বকীয় অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জীবন সংগ্রামই এর ভিতরের অব্যক্ত কারণ। ভাবে না হক তাঁর থেকে ভাষা ও ভঙ্গীতে অনেক দূরে সরে যাওয়া জীবনধর্মেরই অভিব্যক্তি। উত্তাল তরঙ্গময় সমুদ্রের মধ্যে বুদবুদের স্থায়িত্বের আকাঙ্ক্ষার মত জীবন লিপ্সা।

আমার নিজের পক্ষে অবশ্য ব্যাপারটা ছিল বিপরীত—আমার কবিতা নয়, আমার কাব্য জীবনকে বাঁচাতে হলে, অর্থাৎ কবিতার স্বকীয়তা হোক বা না হোক কবিতার আনন্দকে রক্ষা করতে হলে, চিন্তায়, মননে, ধ্যানে জ্ঞানে তাঁর থেকে দূরে যাবার কোনও ইচ্ছা বা উপায় ছিল না। আমার মনের সমস্ত ঊর্ধ্বগামী কল্পনা ও আবেগ সেই আদিত্যবর্ণ 'পুরুষম্ মহান্তম্'কে কেন্দ্র করে আপনার কক্ষপথ তৈরি করে নিয়েছিল, কোনো প্রলোভনই তাকে সে পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারত না। 'ছায়েবানুগতা' হবার যে কি ত্রুটি থাকতে পারে, বা বুদবুদের সদ্যপাতিত্ব সম্বন্ধে সে সময়ে কেউই আমাকে সচেতন করতে পারত না।

কিন্তু কারণ যাইহোক, বর্তমানে কবিতার আঙ্গিকে যে বৈচিত্র্য প্রচলিত হয়েছে সেটা এ যুগের বিশেষত্ব—এবং কোনো মানুষই যুগধর্মকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে বাঁচতে পারে না। তাই আমার কবিতার উৎস ফল্গু হল। আজ যে আবার নূতন করে ছাপার অক্ষরে সেই মরা নদীকে খুঁড়ে তুলতে চাইছি—এ

একটি স্পর্ধাও বটে। উঁচু হিল তোলা জুতো ও ববকরা চুলের সমারোহের মধ্যে আলতা পরে চিকনপাটি খোঁপা বেঁধে গিয়ে উপস্থিত হওয়ার মত।

তবুও এ শখ একেবারে দমন করা যায় না। লেখকের উপায় নেই মাঝে মাঝে পাঠকের সামনে না গিয়ে—এ অভিসার অনিবার্য, বিপ্রলব্ধা হবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও।

১৯৩০ সালে আমার ষোল বছর বয়সে প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উদিতা' প্রকাশিত হয়। এ ব্যাপারে আমার স্বর্গীয় পিতা—সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তর সম্পূর্ণ দায়িত্ব। আমার কবিতা সম্বন্ধে তাঁর ধারণা তখনকার যুগের স্নেহান্ধ পিতামাতারই উপযুক্ত ছিল। কোনো নিরপেক্ষ সমালোচনা সে স্নেহের সমুদ্রে হাল ধরতে পারত না। বালিকার কাব্যগ্রন্থর অতবড় ভূমিকা রচনা করা বিশ্বকবিরও স্নেহধারারই চিহ্ন, কিন্তু তিনি তখন ঐ গ্রন্থপ্রকাশে আগ্রহী ছিলেন না। ভূমিকা থেকে সেই অংশটুকু আমার পিতা কবিকে অনুরোধ করে বাদ করিয়ে নিয়েছিলেন। যে কারণে কবির আপত্তি ছিল তিনি মনে করেছিলেন কারণটি দেওয়া থাকলে সে বিপদ ডেকেই আনা হবে। কিন্তু ভূমিকাটিতে সে সময়ের সাহিত্য সমালোচনার প্রকৃতি সম্বন্ধে কবির অভিমত বর্তমান কালেও অবশ্যই জানবার মত, বস্তুত এখনও সে প্রকৃতির পরিবর্তন হয়েছে কি না সন্দেহ। সেই জন্য এখানে আবার সেটি ছাপান গেল, এ ভূমিকা পুরানো কবিতার, নূতনের নয়, তাই কয়েকটি পুরানো কবিতাও এখানে পুনর্মুদ্রিত করলাম। 'উদিতা' ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৩০ সাল পর্যন্ত রচিত কবিতা থেকে সংগৃহীত—সে হিসাবে লেখিকার বয়স ও গুণগত দিক থেকে না হলেও রচনাগুলি কামিনী রায়, প্রিয়ম্বদা দেবী, প্রফুল্লময়ী দেবী প্রভৃতির কিছু রচনার সমসাময়িক—অতএব অবশ্যই জরাক্রান্ত। আর মহিলা কবিদের মধ্যে স্বর্গীয়া উমা দেবীর 'বাতায়ন' শ্রদ্ধেয়া রাধারাণী দেবীর 'লীলাকমল' আর 'উদিতা' একই বছরে প্রকাশিত হয়।

ভূমিকার মধ্যে যে তত্ত্বচিন্তার কথা আছে সে কথার একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। আমরা সে সময়ে দার্শনিক চিন্তার এক ঘনীভূত স্তরে বাস করতাম। আলোচনা, তর্কবিতর্ক যা কিছু চিন্তা ও পঠন পাঠন হত সমস্তই 'পরম' (absolute) বা পরম সদবস্তুর (ultimate reality) সঙ্গে সম্বন্ধযুক্ত হয়েই হত। এ রকমটি যে হতে পারে তা এ যুগে বসে ধারণাই করতে পারি না। অন্তত আমাদের কাছাকাছি কোনো পরিবার চোখে পড়ে না যেখানে এমনটি হয়ে থাকে। মাঝে মাঝে ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের কাছে পিতার সঙ্গে যেতাম তিনি তখন ল্যান্সডাউন

রোডে তাঁর মেয়ের বাড়িতে থাকতেন, যা কিছু কথাবার্তা হত তার একাংশও বুঝতাম কিনা সন্দেহ—কিন্তু বোঝার একটা প্রতিভাস জন্মাত—সেটা কাব্য পড়ার চেয়ে কিন্তু কম আনন্দজনক ছিল না। তাই সেইভাব কাব্যের প্রেরণাও হতে পারত। নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে জগতের অর্থকে আবিষ্কার না করে সে যেন এক কুয়াশাচ্ছন্ন বাতাসে ভেসে যাওয়া। কিন্তু সে পথ ছায়াময় অবাস্তব। আবিদ্যার ভিতর দিয়েই পরা বিদ্যায় পৌঁছবার পথ, তা না হলেই ভূয় ইব তমো।

আজকের দিনের অল্পবয়সীদের মনে পলিটিক্স কতকটা এই জায়গা নিয়েছে—মার্কস কি বলেছেন আর বলেন নি, নিজের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পূর্ণ অসম্পৃক্ত সেও এক অবাস্তব রাজ্য। নিজের অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে পদে পদে জীবনকে স্পর্শ করে চলাতেই চরম কাব্য আর পরম জীবনদর্শন। সেখানেই অমৃত পান—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে

মৈত্রেয়ী দেবী

গ্রন্থসূচী

বাল্যকাল থেকে শুরু করে সমস্ত জীবনভোর মৈত্রেয়ী দেবী অজস্র কবিতা লিখেছেন। তার সেই সাহিত্যকৃতির একটি ধারাবাহিক পরিচয় কবিতা পিপাসুদের কাছে পৌছে দেবার ইচ্ছায় এই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ করা হল। কবির প্রকাশিত বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ, বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত অথচ কাব্যগ্রন্থে অপ্রকাশিত এবং অপ্রকাশিত কবিতাপুঞ্জ থেকে বিশিষ্ট ও বিভিন্ন ভাবধর্মী কবিতাগুলি চয়ন করে কবিতার এই স্তবকটি পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হল। বর্তমান সংকলনের একটি ধারাবাহিক পরিচয় যাতে পাঠকেরা পেতে পারেন তার জন্য কবিতার একটি সংক্ষিপ্ত তথ্য সূচিপত্রের সঙ্গে দেয়া হল।

ক্রমিক সংখ্যা	কবিতার নাম	পৃষ্ঠা	প্রথম প্রকাশের তারিখ	গ্রন্থ। পত্রিকার নাম
১৫	বহ্নিমুখ	৩৩	১৯৪৬	
১৬	পরাজিত	৩৫	১৯৪৭	
১৭	ঊর্ণনাভ	৩৭	১৯৪৭	
১৮	যুদ্ধোত্তর	৩৯	১৯৪৭	জয়শ্রী
১৯	পঁচিশে বৈশাখ	৪২	১৯৫০	
২০	ভাষা	৪৪	১৯৫৮	কবিতা
২১	স্মৃতি	৪৮	১৯৫৮	জয়শ্রী
২২	প্রথম প্রৈতি	৫০	১৯৫০	
২৩	মানুষ	৫৩	১৯৫০	



বর্ষার আয়োজন

বিজলী থেকে থেকে উঁকি মারে মন
বর্ষা নাই তার রয়েছে আয়োজন
আকাশে ছেয়ে আছে গম্ভীর কালো মেঘ
নামানি হতে মনে শাহার অভিষেক
দুয়ার খুলে রেখে বসিনু তারি আশে
ওপারে ডেকে গেল সবুজ ঘন ঘাসে
একটি আশে মধি এসেছে নীচু নেমে
সকাল হতে মন রয়েছে থেমে থেমে
আকাশ কালো হলো সঙ্গীত ব্যাকুলতে
গাছটি ছায়া মনে পড়িল কালো হয়ে
গাছের তলে সাথে গোয়ালা গেল ভেবে
বাছুর কোথা ওরে ফিরিছে কেঁদে কেঁদে
একটি ফল লয়ে বসিয়া মুখো মুখি
শালিক দুই শত্রু করিছে চোখাচুখি
বধূর মত ওই মাধবী লতা মত
শিহরি উঠে লাজে করিছে মাথানত।
জলের ছায়া তলে দামিনী যায় ছেয়ে
বিশাল আগে তাল ওপারে নেচে উঠে
সবুজ ধুতুন মনেতে বুকে বুকে
দুধারে হেলে দুলে দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ঝুঁকে

মলিন রঙে আজ মেলেছে এত মায়া
আমার বুকে তার ফেলেছে ঘন ছায়া।

—

[illegible]

[illegible] ২২ [illegible]

কোনো কথা নহে

কোনো কথা নহে আজ কোনো কথা নহে
আজ শুধু রহ বসি নিস্তব্ধ নির্বাক,
অন্তরের ব্যথা যদি ভার হয়ে রহে
তবু আজ মৌন রহ, সব পড়ে থাক।

এই ঘন বনতলে স্নিগ্ধচ্ছায়া পর
মেলে রাখ স্থির তব বিমুগ্ধ অন্তর।
ইন্দু যবে ঢালে আলো সিন্ধু গরজায়
অকূল তরঙ্গ ভাঙ্গে পাগলের প্রায়
শুক্তি ভাঙ্গি মুক্তা যত ছড়াইয়া পড়ে
দূরে দূরে সিন্ধুতটে বালুকার পরে।
রবি দীপ্তি উদ্ভাসিত স্বুবর্ণ আলোকে
এ বিশাল বিশ্বখানি দেখ শান্ত চোখে
অবরুদ্ধ করে রাখ বাণী। কথা যত
মর্মমাঝে লুপ্তি পাক, হে কবি সতত
নিস্তব্ধ অন্তর হতে অমৃতের ধারা
বাক্যের বন্ধন মুক্ত তাই সীমাহারা
সব দ্বন্দ্ব অবসান, তর্ক ঘুচে যাক
তোমারে করিয়া দিক নিঃশব্দ নির্বাক
উদ্বেলিত চিত্ত বেগ শান্ত হয়ে রহে
কোনো কথা নহে আজ কোনো কথা নহে

এই মহা শান্তি মাঝে স্নিগ্ধ দৃষ্টি হানি
রাখি শুধু একবার চোখে চোখখানি

আসিয়া দাঁড়াও এই কানন নিছায়
হাসিয়া দাঁড়াও এই পথের ধূলায়
কাঁদিয়া দাঁড়াও এই শিশিরের জলে
এ উন্মুক্ত আকাশের চন্দ্রাতপতলে
যেথা দূর দূরান্তরে বিশ্ববায়ু বহে
কোনো কথা নহে আজ কোনো কথা নহে

১৯২৬

পরিণতি

লহ মোরে লহ মোরে চল মোরে লয়ে
আমার এ স্বপ্ন-স্রোত যেথা গেল বয়ে
কালের এ সমুদ্রের স্তব্ধ হবে গতি
বাসনা বিমুক্ত দেহে পাবে পরিণতি
ক্ষুদ্র এ জীবন। দৃশ্য যাবে মুছে
বাধা বন্ধহীন পথে মোহ যাবে ঘুচে,
আশাহীন ভাষাহীন শেষ সেথা সব
পান্থহীন পথ পরে নাহি কলরব
জন্মহীন, মৃত্যুহীন, নাহি রবে কাল
নাহি রাত্রি নাহি দিন না হয় সকাল,
চাওয়া নাই পাওয়া নাই শেষ সব হবে
এ ভ্রান্তি ঘুচিয়া যাবে আত্ম অনুভবে।

আকাঙ্ক্ষার আবর্তন শান্ত করে সেই
প্রদাহ শীতল করে সে কি কিছু নেই
অবিশ্রান্ত কর্মক্লান্ত সকলের ক্লেশ
এ দুরন্ত বহ্নিশিখা করে দিয়ে শেষ
সমস্ত হরণ করি দিতে পারে সব
চিত্ত পরিপূর্ণতায় অতুল বিভব।
পৃথিবীর মিথ্যা হতে পারে যদি নিতে
মহা পরিণতি মাঝে সত্যের জ্যোতিতে

নিয়ে চল নিয়ে চল জান যদি পথ
পিছে ফেলে অভিশপ্ত খণ্ডিত জগৎ
মুগ্ধ অন্ধকার হতে জ্ঞান শিখা হাতে
সবার অচেনা পথে, সবার অজ্ঞাতে।

১৯২৭

রিক্ত ও মুক্ত

সে কোন রাতে ভেবেছিলেম
একলা বাহির হব
সঙ্গে আমার সঙ্গী নাহি লব,
শয্যা ছেড়ে উঠে এসে
খুলে দিলাম দ্বার
সম্মুখেতে স্তব্ধ আকাশ
গভীর অন্ধকার
পৃথ্বী যেন সর্বহারা
মন্ত্র ছায়াময়
আজ আমারে বিশ্ব মাঝে
নিঃস্ব মনে হয়।

পথের পাশে বাঁশের ঝোপে
কৃষ্ণচূড়ার গাছে
আমার পরম শূন্যতা যে
নিবিড় হয়ে আছে
সম্মুখে মোর চলেছে পথ
কোথায় নাহি জানি
মৃত্যু যেন মূর্ত হয়ে ফেলেছে জালখানি
সেথায় এলেম নেমে
ক্ষণেক আমার মুক্ত ছুটি
দ্বারের পাশে থেমে।

অন্তবিহীন অন্তরেতে
চিন্তা নাহি জাগে
আপনারে ভিন্ন বলে
মুক্ত বলে লাগে
কখন দেখি সম্মুখে মোর
আঁধার গেছে টুটে
রক্ত উষার ওষ্ঠপুটে
হাস্য ফুটে উঠে।
রাতের মায়া পড়ল ছিঁড়ে
দীর্ঘ পথ মাঝে
হৃদয়ে মোর এমন করে
দৈন্য কেন বাজে ?

পুষ্প মেলে মুগ্ধ আঁখি
পক্ষী ওঠে জেগে
উচ্ছ্বসিত পূর্বাকাশের
রশ্মি-রেখা লেগে।
রাত্রি ভরা স্বপ্ন মাঝে
গর্বে ছিনু ভরি
আপনারে রিক্ত হেরি
মুক্ত মনে করি।
এখন মনে হয়
এ শূন্যতায় রিক্ত করা
মুক্ত করা নয়।

১৯২৯

পূর্ণিমা

সেদিন পূর্ণিমা রাতে
প্রচ্ছন্ন আলোকে
আপনারে কি আশ্চর্য লেগেছিল চোখে
নিস্তব্ধ আকাশে লেখা
এতটুকু মেঘ রেখা
তারা ছোট ছোট
পূর্ণিমায় ধোয়া যেন
ফুল ফোট-ফোট।
রজনীগন্ধার গাছে
সত্তপাতি পুষ্প মাঝে
কি জানি কি লেখা
সুগন্ধ অদেখা
এসে শুধু মর্মমূলে লাগে
ঘুমন্ত রজনী হতে কোন মায়া জাগে।

আমার এ হৃদয়ের তল
তরঙ্গিত হয়ে ওঠে আবেশে চঞ্চল,
শুষ্কপাতা ঝরে বনে
নিশীথের সমীরণে
শব্দ শুনি ক্ষীণ
তোমারে দেখিনি বহুদিন
তবু তাই নিয়ে বসে
বিরহের গাঁথা রচিব না।

আমার হৃদয় মাঝে
আজ যত ধ্বনি বাজে
নহে তাহা বিরহ বেদনা
নহে স্মৃতি মিলনের
গত শত দিবসের
স্পর্শ অনুপম
এই যে শুধু মম
উদ্বেলিত হৃদয়ের ধ্বনি
জ্যোৎস্না সিক্ত বনপথে
ওঠে রণ-রণি।

যে আনন্দ পরশ রতন
আমারে বাজায়েছিল বীণার মতন
সে ধ্বনি এখনও থামে নাই
মুগ্ধ এই জ্যোৎস্না রাতে তাই
হৃদয়ের শত শত তার
গগন মথিয়া তোলে বিহ্বল ঝঙ্কার
শুধু পাওয়া না পাওয়ার
বেদনা এ নয়
ভাষার অতীত সুরে মথিত হৃদয়।

১৯৩০

কবি

কর্ম যত সৃষ্টি যত পুষ্প যত ফোটে
মৃত্যু হতে জন্ম লভি ঊর্ধ্বপানে ওঠে।
চৈত্র বায়ে পত্র ঝরে শুষ্ক নদীময়
মৃত্যু মাঝে জন্ম নব রুদ্ধ হয়ে রয়
আনন্দিত চিত্ত তব উচ্ছলিত সুর
সৃষ্টি করে গীতধ্বনি স্বপ্ন সুধাপুর
ধ্বংস হতে সৃষ্ট সে নয় সে যে মুক্তধারা
আনন্দেরি অমৃততে তাই সে মরণহারা।
জোয়ার আসে চিত্ত হতে ভাটার নাহি ভয়
উদ্বেলিত তরঙ্গেরি মত্ত ধ্বনি বয়,
পৃথ্বী মেলে মুগ্ধ আঁখি আত্মা ওঠে জেগে
উৎসারিত ছন্দ গীত স্নিগ্ধ জ্যোতি লেগে।
মৃত্যুহারা গানের ধারা চতুর্দিকে বয়
বিশ্বজনের চিত্ত করে নিত্য সুধাময়
অনিত্য যে ছন্দবাণী আজ তোমারি দ্বারে
যুক্ত হল চিরকালের মুক্ত পারাবারে
অনন্ততে লিপ্ত হয়ে লুপ্ত তাহার সীমা
অমৃততে সঞ্চারিত সুরের মধুরিমা।
পন্থাহারা অখণ্ডকাল স্তব্ধ হয়ে রয়
সঙ্গীতেরি ছন্দে তব বিশ্ব-জীবনময়।

১৯৩০

জয়ন্তী উৎসব

শুভদিনে ভক্ত যত গেল দেবালয়ে
নত নেত্রে, মুগ্ধ হাতে অর্ঘ্যথালা লয়ে
বিকশিত পুষ্প দলে দিল অবিরাম
অসংখ্য অঞ্জলি আর অসংখ্য প্রণাম।
অনন্ত এ নিখিলের কাল অগণন
একটি মুহূর্ত আসে পরম শোভন
শুষ্ক বৃক্ষ শাখা হতে ঝরে পুষ্পরাজি
দিকে দিকে সে মুহূর্তে শঙ্খ ওঠে বাজি
ত্রিলোকের মর্মে মর্মে বাজে ধ্বনি তার
অনন্ত আকাশ হতে কলস সুধার
ঝরে নিখিলের পাত্রে। তারি মধুরিমা
প্রকাশে অমেয় শক্তি, অপার মহিমা।

মানুষের জয়গানে প্রকৃতির প্রাঙ্গণ কোণায়
নীরব অর্ঘ্যের থালা ভরেছে সোনায়
তোমার বন্দন বাণী পূজার অঞ্জলি
সেদিন সাজানো হল, আজ এ সকলি
গৃহকোণে অক্ষমের যত আয়োজন
মিথ্যা হল। তোমার কি আছে প্রয়োজন
তুচ্ছ মোহে? ইহাদের আত্ম অভিমান
তোমারে কভু কি পারে সঁপিতে সম্মান?
লক্ষ চিত্ততটে জাগে অরুণ আভাস
অবরুদ্ধ জীবনের তুমি কি আকাশ?

তুমি কি আনন্দ জ্যোৎস্না ধেয়ানে মগন
মানস গগন তীরে ?   এ শুভ লগন
বেহাগে ধ্বনিত হয়ে ওঠে মুগ্ধস্বর
তোমার তোরণ দ্বার জনতা মুখর
অসংখ্য চরণ-ধ্বনি, নৈবেদ্যের থালা
প্রজ্জ্বলিত ধূপ-শিখা পুষ্প-গন্ধ ঢালা
উচ্ছ্বসিত উৎসবের আনন্দ উছল
সেথা মোর প্রবেশিতে নাহি ছিল বল।
সেই মুক্ত দ্বার প্রান্তে চির জীবনের
করুণ অঞ্জলি ছিল অশক্ত ভক্তের
পূর্ণ চরিতার্থতার স্নিগ্ধ দীপ্তি লিখা
নিরুদ্ধ এ অন্তর্মূলে সে নিষ্কম্প শিখা।
মেঘমুক্ত জীবনের জ্যোৎস্নাময়ী শশী
পশ্চাতে ফেলেছে মোর রজনী তামসী
তোমার চরণ-ধ্বনি ভরে বারবার
এই পথবর্তিনীর হৃদয় ভৃঙ্গার
সার্থক অস্তিত্ব পেল অমূল্য যে দাম
তবু প্রশ্ন নেবে কিনা আমার প্রণাম।

১৯৩২

দুরাকাঙ্ক্ষা

সুন্দর তুমি করনি করনি ভুল
বেদনা গুমরে গোপন মর্মময়
যদিও অঙ্গ কণ্টক সমাকুল
যদি জ্যোৎস্না নামেনি এখনো
হৃদয় প্রান্ত ছেয়ে
তৃষিত আমার চিত্ত রয়েছে চেয়ে
বর্ষা আসিলে কদম্ব ওঠে ফুটে
লক্ষ কলির গোপন বন্ধ টুটে
তবুও দিঘির ধারে
রুক্ষ কেতকী বিকাশিছে আপনারে
বদ্ধ তাহার নব যৌবন রূপ
দেহ হতে ফিরে অন্তরে জ্বালে ধূপ।

সেই সুগন্ধ দূর দিগন্ত ছায়
ধন্য সে আপনায়
অঙ্গে আমার কণ্টক বিঁধে আছে
তবু আমি নয় সিক্ত কেতকী ফুল
ভেদিয়া আমার মর্মের গূঢ় মূল
যতটুকু ওঠে সুধা
তা নিয়ে মেটে না বিশ্বজনের ক্ষুধা।
আমি রহিয়াছি পথবর্তিনী
প্রত্যহ পথ পাশে
যত ম্লান ছায়া আসে
কুরূপ কুশ্রীতায়
প্রতিদিন মোর বদ্ধ হৃদয় জীর্ণ করিতে চায়।

তবুও যে দেখি প্রদোষ আলোতে
প্রভাতের উষালোকে
প্রতিদিন মম চির সুন্দর দাঁড়ায়েছ চোখে চোখে।
বায়ু মর্মরে বাণী
শুভ্র মেঘেতে দূর নীলিমায়
লিখেছ যে লিপিখানি
করেছ শোভন করুণ নয়ন পাত
পোহাবে না তাতে দারুণ দুঃখ রাত !
সব মিটিবে না সাধ,
জীবন ঘেরিয়া তুচ্ছ আর্তনাদ।
লিপিখানি তব লেখেনি চরম লিখা
তীব্র প্রেমের জ্বলেনি দীপ্ত শিখা
তবু এতটুকু ক্ষুদ্র প্রদীপ দিয়া
এতটুকু আলো হেসে ওঠে বিকশিয়া
তবু প্রতিদিন প্রভাত আলোর ভাষা
জাগ্রত করে আশাতীত মম আশা।

১৯৩৬

অসময়

এখনও আমার হয়নি সময়
হয়নি রজনী ভোর
তবু নন্দন গন্ধ বাহিয়া
এসেছ বৎস মোর !
অচেনা অতুল মুকুলিত ফুল
তরুণ অঙ্গভার,
যে অমৃত লয়ে এসেছে আলয়ে
প্রকাশিছে কিছু তার ।

হৃদয় ভরিয়া এসেছ নবীন
ভুবন ভরেছ গানে
রুদ্ধ যা ছিল হল কি মুক্ত
আকাশ এল কি প্রাণে !
তবু মনে হয় এ নহে সময়
এখনও রয়েছে বাকি
ঘুচাতে আমার মনের আঁধার
পুরাতে সকল ফাঁকি !

ঐ সুকোমল স্পর্শের তরে
কঠিন এ কোল মোর
এখনও ভাগ্য করেনি যোগ্য
লভিতে অঙ্গ তোর ।
এখনও হৃদয় সুন্দর নয়
অনেক দৈন্য গ্লানি
লোভ মোহ পাপ ছোটছোট শাপ
করিতেছে হানাহানি ।

অপূর্ণ মন ক্ষুদ্র জীবন
ঘিরেছে তুচ্ছতায়
দেখে মনোলোভা স্বর্গের শোভা
প্রাণ করে হায় হায়
যেন মোর মায়া নাহি আনে ছায়া
যেন মলিনতা মম
আড়াল না করে, রূপে রসে ভরে
সৌরভে অপ্রতিম।

এই পাওয়া তোরে অন্তর ভরে
সার্থক করে নিতে
দিনে দিনে তোর প্রতি কাজে মোর
হবে পরিচয় দিতে।
ঐ অনুপম হাসি দেখে মম
মনে মনে জাগে বল
শুধু ক্ষণে ক্ষণে অজানা কারণে
চোখে ভরে আসে জল।
ন্দী রয়েছি নিজ শৃঙ্খলে
হয়নি রজনী ভোর
বু নন্দন গন্ধ বহিয়া
এসেছ বৎস মোর।
মুখে সহাস, স্বর্গ প্রকাশ
যেন এ আশীর্বাদ
াঙ্গিয়া শুক্তি লভিব মুক্তি
এনেছে সে সংবাদ।

উৎসর্গ

অক্ষম কেন লেখনী আমার
কিছু না জোগায় কথা
মর্ম চেতনা সঞ্চারি ফেরে
চঞ্চল আকুলতা।
ছায়ার মতন এসে ভেসে যায়
চিন্তা সূত্রহীন
অতি ক্ষীণ তার রূপ সম্ভার
সংশয়ে বিমলিন।

দিগন্ত ব্যাপী দূর নীলিমায়
ঘন জলদের ছায়া
ছোঁয়ায় হৃদয়ে সে কোন বিরাট
অশরীরী এক মায়া।
প্রতি মানুষের মুখে যবে চাই
মনে হয় যেন আছে
অন্তবিহীন তপস্যা কার
তার অন্তর মাঝে।
প্রতি পল্লবে তরু গুল্মতে
কি স্পর্শ মনে লাগে-
চারিদিকে মোর স্তব্ধ জগৎ
সুমহৎ হয়ে জাগে !

সেই অনন্ত পটভূমি পরে
কুঁড়ি এতটুকু ক্ষীণ
কী তুচ্ছ তার আত্মপ্রকাশ—
কত সে মূল্যহীন !

তবু দুর্বল সাধ কেন জাগে—
ভীত কম্পিত চিতে
শরম সিক্ত অবগুণ্ঠন—
মুখ হতে ফেলে দিতে।
পরম ধৈর্যে প্রতিদিন তুমি
কত দিলে মোরে আশা
শিশুকাল হতে শিশু কণ্ঠের
শুনেছ তুচ্ছ ভাষা
শিথিল মননে অস্ফুট ভাব
ফুটেছে যা মনে মনে
নত শিরে আজ এনেছি আমার
সলজ্জ নিবেদনে।

১৯৩৬

বিপ্রলব্ধা

গিরি বিলম্বি জলদের নিচে
কাঁপে অরণ্যছায়া
জানি না সে কোন স্বপ্ন লোকের
কল্প রচিত মায়া।
জলসিঞ্চিত মন্থর হাওয়া
আনে কোন প্রত্যাশা
তুষারাবৃত তুঙ্গ শিখরে
ধ্বনিত বিশ্ব-ভাষা।
পাহাড় আড়ালে গুহায় আমার
নিদ্রিত দেহ মন
ঘন কুয়াশায় কেবলি হারায়
মরে যায় অকারণ।

হৃত সৌরভ স্খলিত ছন্দ
প্রতিহত ঝঙ্কারে
যাবে না সে আর জন-কল্লোলে
নির্লাজ অভিসারে।
শত প্রতিভার বহ্ন্যুৎসবে
যেথা সঙ্গীত বাজে
ছিন্ন চরণে বিপ্রলব্ধা
যেথা হতে ফিরিয়াছে
যে মোদিত সাধ স্বপ্নে বিলীন
স্মরণ চিহ্ন তার
দুঃসহ হল জীবন সীমায়
হল দুর্বহ ভার।

কবে একদিন উদয় আলোক
ভালে অর্পিল টিকা
জ্বলেছিল মোর বিস্মিত মনে
উর্ধ্বমুখিন শিখা।
আজ সে প্রদীপ আঁচল আড়ালে
বিমুখ বাতাস হতে
রুদ্ধ দুয়ার দেহলির পরে
বাঁচিয়েছি কোনো মতে
উদ্ভাস জ্যোতি জ্যোতিষ্কলোকে
সে নহে শুভ্র তারা
প্রত্যহ তার আলোকে আমার
গৃহ কাজ হয় সারা।

তবু কাঁদে কেন শূন্য জীবনে
চির পরাভূত আশা
মৃত্যু সাগরে ঝাঁপ দিতে চায়
অশ্রুদ্বেল ভাষা।
দিব না কখনো ভাগ্যের দোষ
জানাব না অভিমান
নিত্য বিমুখ সংসার তলে
কাঁদুক রুদ্ধ প্রাণ।
অশ্রু সজল পতিত ছন্দে
যে বেদনা গেঁথে আনি
সে নহে কেবল ব্যর্থ মনের
অন্তবিহীন গ্লানি,
সে মম মুক্তি যে মুক্তি লাগি
তপস্বী ফিরিয়াছে

সে মম মুক্তি যে মুক্তি বীর
মৃত্যুতে লভিয়াছে।
ভীরু প্রদীপের শিখা নিয়ে হাতে
পার হয়ে গৃহ কোণে
কভু ভাবি যাব অনাস্বাদিত
জীবন অন্বেষণে।
আলোর বছর দূর হতে আসা
নব সূর্যের জ্যোতি
মাটির প্রদীপে পরায়ে করিব
একটি সন্ধ্যারতি।

১৯৩৮

জন্মান্তর

প্রথম প্রভাত হতে বারে বারে ফিরে
এসেছি এ সমুদ্রের তীরে
নিয়েছি আপন হাতে ভার
জীবন মন্থন করে চিনিবারে রূপ আপনার
টুটেছে হৃদয় গ্রন্থি
ফুটেছে সে নিত্য জ্যোতির্ময়
অতল অদৃশ্য হতে প্রজ্ঞা অসংশয়।
তবু আজ প্রাণ হয় বোঝা
প্রতিদিন পূর্ণ করি তারে
সীমাহীন অজ্ঞানের গভীর রাত্রির অন্ধকারে।
কে আমি এসেছি কোথা
নিয়ে কোন অসঙ্গত আশা
নব জীবনের পানে উদ্‌গত উন্মত্ত ভালোবাসা।

প্রাণের বঙ্কিম স্রোতে নৃত্যশীল গতি
অদৃশ্য অলক্ষ্যে তুলে বিস্মিত প্রণতি
কোথায় চলেছ নিয়ে
এ চলা কি ফিরে ফিরে আসা ?
সোনার শৃঙ্খল পরে মূঢ়ের গভীর ভালোবাসা।
কেন চলা অবিরাম কেন এই দূরে দৃষ্টি হানা
সে দূর নিকটে যদি সে পথ একান্ত যদি জানা !
স্তব্ধ গুল্ম শাখা মাঝে নীরবে কাঁদিয়া মরে প্রাণ
এ কোন আবর্তে তার প্রতিদিন কাহারে সন্ধান ?

আশা করে কোন পূর্ণতার
অনন্ত এ পরিক্রমা, চরণের গতি দুর্নিবার।
কে প্রিয় এ ধূসরিত দেহে
অপ্রতিম লাবণ্য যে নিয়ে আস নব নব স্নেহে।

সুন্দর নীলিমা তাই ভুবন সুন্দর
সুগন্ধে বিলীন তাই পুষ্পের অন্তর।
উদয় সাগর হতে আসে স্নাত উজ্জ্বল প্রভাত
অপূর্ব বেদনা আনে মৃত্যুময় অন্ধকার রাত।
অতৃপ্ত উদ্ধত প্রাণে এ মাধুরী
আনে না প্রত্যয়
জীবনের অর্থ খোঁজে শুধু মাত্র প্রেমসুধা নয়।
যে কাল পিছনে ছিল
সে কাল সমুখে ফিরে আসে
অবগুণ্ঠিত মুখে তারকাখচিত পট্টবাসে।
কে তারে ভূষণ দিল, দিল অলঙ্কার
ক্ষণস্থায়ী ঐশ্বর্যের বসন্ত বাহার?
স্পর্শহীন স্রোতে তার রূপহীন আবেগে অতুল
কে ফোটাল ফুল?

শূন্যের সমুদ্র হতে নিমেষে নিমেষে ধরে কায়া
বেলাহীন বেলা-তটে তরঙ্গের মৃত্যুময়ী মায়া
সে ঊর্মি জানে কি কেন তার
অনন্ত চেতনাময় ক্ষণিকের নৃত্য আপনার?
শুধু এক বৃন্তহীন ফুলের বাগান
মূলহারা শূন্যে স্পন্দমান।

তবু কে জাগালে মোরে
কে হরিলে অন্ধকার রাত
একটি মুহূর্তে ভরে অনন্তের চির সুখস্বাদ
কি তোমারে দেব প্রতিদিন
মরণে সার্থক করে চরণের গতি অন্তহীন !

১৯৪০

অভীপ্সা

প্রদোষের অন্ধকার থেকে
যে নৈবেদ্য প্রতিদিন তোমার অলক্ষ্যে গেছি রেখে
শীর্ণ অগ্নিশিখা
কম্পমান হাতে জ্বালা ধূম্রলীন শিখা।
বসন্ত সন্ধ্যায় আর আষাঢ়ের জলসিক্ত রাতে
উন্মোথিত চিত্তভার প্রত্যহের তুচ্ছ বেদনাতে
অশ্রুতে বিম্বিত হওয়া প্রতিচ্ছবি তব
করেছিল এই ত্রিভুবন অভিনব।
সে মরু তৃষিত পথে কি ছিল জীবনে
যদি জলদর্চিত প্রত্যূষ পবনে
বেদনা তরঙ্গ হয়ে পার
সুদূর দিগন্তে নাহি উদ্ভাসিত ঐশ্বর্য তোমার।

যে তোমার অভীপ্সায় আবর্তিত সব দুঃখ সুখ
কাছে তবু বহু দূরে, উদাসীন তবুও উন্মুখ।
তীব্র তীক্ষ্ণ স্পর্শ ক্ষুরধার
মাটির মূর্তিতে করে জীবন সঞ্চার।
সেদিন প্রথম লাগে ভালো
সপ্তপর্ণ কিশলয়ে প্রত্যূষের আলো।
অতন্দ্রিত রাত্রিভরে, আকাশের জ্যোতিষ্ক বিন্দুতে
ফুলে ঘাসে এ বিশ্বের ঐশ্বর্য সিন্ধুতে।
এসেছে জোয়ার
এ দুরন্ত আকর্ষণে স্পর্শনে তোমার,
চৈতন্য মন্থিত করে অমৃত সম্ভবে
জেনেছি এ অস্তিত্বের পূনর্জন্ম হবে।

তখন ভেবেছি মনে প্রসাদ ফিরিয়া নাহি চাব
অদৃশ্য মন্দিরে তব অমলিন অঞ্জলি পাঠাব।
যদি সেই বরমাল্যে ম্লান আজ দেখো কোন ফুল
সে আমারি দৈন্য জানি কাঁদায় যে আশা অপ্রতুল।
তবু তুমি ফিরে চাও, ফিরায়ো না মুখ
অতল বিরহে মোর, উদ্যত উন্মুখ
কেন কাঁদে ক্ষুধা
বনপুষ্প রন্ধ্রচারী, পতঙ্গের মত খুঁজে সুধা,
কেন দৃষ্টি খোঁজে মরীচিকা
যে অলব্ধ সরে যায়,
ফেলে তার মায়া যবনিকা—
স্বপ্নছবি এঁকে আকাঙ্ক্ষার
যৌবন বিশীর্ণ মম, বহে সেই সীমাহীন ভার।

বিনিদ্র রজনী কেন, কি অনুসন্ধানি,
অজ্ঞাত উদ্যান খুঁজে প্রত্যাশার পুষ্প তুলে আনি।
কেন ভ্রান্ত আশা
আকণ্ঠ তৃষিত করে কাঁদে এ পিপাসা ?
তবু তুমি ফিরায়ো না মুখ
প্রসন্ন কটাক্ষপাতে শ্রীহীন এ বাসনা উন্মুখ
পাক তার অপ্রাপ্য সম্মান
উন্মুক্ত প্রকাশে হোক এ চরম পূজা অবসান।

এ শুধু আনন্দ নহে, নহে শুধু সপ্রশংস নতি
বীরের এ অর্ঘ্য নয়, শুধু চিত্ত রতি,
সমস্ত জীবন মম, নিয়ে তার ক্ষয়ক্ষতি সব,
তোমার বিগ্রহ তলে পরিপূর্ণ জীবন উৎসব

মিথ্যা হোক গর্ব অহঙ্কার
এ পুষ্প বিশীর্ণ কান্তি, পরাজিত গৌরব তাহার,
উৎসর্জিত লজ্জা ভয়, প্রতিহত আশা—
তবুও পাঠাব মোর বাসনা নিমগ্ন ভালোবাসা।

১৯৩৯

পুরানো ও নূতন কবিতা

একদিন কবিতার পাখা ছিল,
রঙিন কত কী তাতে আঁকা ছিল
উড়িত সে আকাশে
কখনো মদির হত বিলাসে
কভু উত্তাল বন্ধনহীন বেগে
জীবন মথিত ডানার ঝাপট লেগে।
চোখে যা দেখিনি, কানে যা শুনিনি কথা,
হৃদয়ে অতল স্তব্ধ যে নীরবতা
অমাবস্যার রাতের মতন কালো
বাণীহীন মনে শূন্যতা যা ঘনালো
তার মাঝে সে যে সহসা দিয়েছে ডুব
মানব মনের সেই কথা-হারা রূপ
স্পর্শে তাহার হঠাৎ গিয়েছে খুলে
ডুবুরীর মত মুক্তা এনেছে তুলে।

বন্ধুর পথে ধুলো তুলে চলে
দীর্ঘ পথের যাত্রী
সহসা যখন ঘনায়ে এসেছে রাত্রি,
অন্তবিহীন দুঃখের ঘায়ে
ভোলে জীবনের তত্ত্ব
পথহারা মনে এক হয়ে যায়
সকল সত্যাসত্য।
সে যেন তখন বিদ্যুৎ শিখা
উদ্ভাসি চারিদিক,

ভিন্ন করিয়া অন্তরীক্ষ
চেয়েছে নির্নিমিখ,
বিমূঢ় পথের পথিকের চোখে চোখে।
স্বর্গীয় সে আলোকে
কত মানুষের আলোকিত হল বর্ত্ম
আভাসে দেখালে সন্ধানহীন তত্ত্ব।

সেই একদিন কবিতা যখন যেত উড়ে
ছন্দের নাচে সুরে সুরে
উত্তাল হয়ে মর্ত্যে পাতালে মেলে ডানা
অন্তরীক্ষ মন্থন করে স্বর্গের দ্বারে দিত হানা।
যায় না তাহার পেলব কান্তি হাতে ছোঁয়া
কত মানুষের অশ্রু গলান প্রেমে ধোয়া
তখন তাহার অন্তর্লীন, জ্যোৎস্না বিলীন সৌরভে
মানব মনের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সঙ্গীত বাজে গৌরবে।
উর্ধ্বমুখিন যে আত্মা কাঁদে ক্ষুধাতে
মুহুর্মুহু সে ভরে তার তৃষা সুধাতে
স্বর্গ-মর্ত্যব্যাপিনী পক্ষ বিস্তারি
শৃঙ্খল ভেঙে প্রত্যহ দিল নিস্তারি
কত আবদ্ধ অন্তর্গূঢ় বাণীকে
ভস্মে লুকান মানিকে।

একদিন কবিতা যখন জ্বলিত
লাবণ্যভরা সে শুধু ছিল না ললিত
প্রমত্ত মনে দাহ করে অর্গল
আকাশ বিহারী উল্কা শরীরে
জ্বেলেছে সে দাবানল।

সর্বনাশা সে অগ্নির তেজে
ভুলায়ে দিগ্বিদিক
কত মানুষের হৃদয়ে জাগাল ব্রাহ্মণ সাগ্নিক।
সে আগুন নয় কৃষ্ণবর্ত্ম,
সপ্তরঙ্গের যজ্ঞ,
কত প্রাণ সেথা আহুতি দিয়েছে অঙ্গ।
কায়াহীন যেন চেতনা জ্যোতির্ময়
আকাশ লগ্ন শিখার মতন রয়।

আজ সে শিখার পুড়ে গেল নাকি সলিতা ?
নিবে গেল দীপ ?
রূপহীন হল ললিতা ?
যে পাখা দুলিত দুঃখ সুখের ঝাপটে
ক্ষুদ্রতা যত প্রাণ-দীপ্তির দাপটে
লুপ্ত হয়েছে, উড়ায়েছে নিঃশর্তে,
উল্লাস ভরা আবর্তে
ঘুরে ঘুরে উঠে জীবনের কত ধারা
দিগদিগন্তে ছুটায়েছে দিশাহারা
আকাশচারী সে পক্ষ আজিকে বিকলে
মাটিতে পড়িয়া আবদ্ধ হল শিকলে।

প্রত্যহ যাহা উড়িতে চাহিত গগনে
জ্যোৎস্নাধৌত লগনে—
আজ তা নিয়েছে নূতন মন্ত্রে দীক্ষা
ছিন্ন কন্থা জড়ায়ে মাগিবে ভিক্ষা।
অন্ন বস্ত্র হাহাকার করা এ ক্ষুধা
বসুহীন ম্লান বসুধা

সঙ্গীতে তার ঢেলে দেবে শত আর্তনাদ
মুমূর্ষু এই আত্মার মুখে
কখনো দেবে না সুধার স্বাদ।
কে চাহে অমৃত ?
অন্ন জোটে না !
মারি ছায়া ফেলে সুদুঃসহ
হবিহীন হলে শূন্য বাতাসে
কেমনে জ্বলিবে হব্যবহ ?
স্বর্গ-মর্তব্যাপিনী পক্ষপুটে
সে আজিকে তাই অন্ন তুলিছে খুঁটে
লুব্ধ মতের, শত তর্কের ধার
ছিন্ন করিছে সে পক্ষ বার বার
নিবেছে আগুন ধূম্ররুদ্ধ বাস
যজ্ঞভূমিতে ফেলিছে দীর্ঘশ্বাস।

১৯৪৬

আশ্রয়

যুদ্ধের হুঙ্কার বেজেছিল
মাঠে ঘাটে বনে
আজ তারি ধ্বনি শুনি মানুষের মনে।
তর্কে তর্কে সমাচ্ছন্ন বিক্ষিপ্ত চিন্তার জটাজাল
তারি মাঝে নিরন্নের ক্ষুধিত কঙ্কাল
ফেরে পথ খুঁজে।
প্রান্তরের শুকানো সবুজে।
ক্ষুধা তার দেহে মনে
ক্ষুধা তার জীবনে যৌবনে
ক্ষুধা তার সর্বগ্রাসী কল্পনার বেগে,
অকস্মাৎ জেগে ওঠে
আতঙ্কিত হয়ে প্রাণ বেগে।
যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা গুণী, সর্ব বাধা জিতে
বার বার আসে পৃথিবীতে
তাঁহাদের পদধ্বনি, তাঁহাদের চিন্তার রঙিমা
অগণিত সামান্যের রাঙায়েছে জীবনের সীমা।
তাঁদের বচনে প্রাণ, তাঁদের চলনে শক্তি লভি
তাঁদের আলোকে দেখি আপনার জীবনের ছবি।
জ্যোৎস্নাধৌত তৃণগুল্ম সম
পূর্ণিমায় ধোয়া হল আজন্ম হৃদয় প্রান্ত মম।
তখন দেখিনি চেয়ে চিত্তের গভীরে আছে ক্ষুধা
তারি দৈন্যে ধীরে ধীরে দীন আজ হয়েছে বসুধা
এ ক্ষুধা অন্নের নহে, এ বুভুক্ষা শুধু দেহে নয়
আত্মার এ ক্ষুধা ফেরে বঞ্চিত মানব চিত্তময়।

মানুষ যে মানুষ হইনি
তাই বিধাতার কাছে প্রত্যেক মানুষ আছি ঋণী।
কবে সেই পূর্ণ হবে দেনা
অমর্ত্য বর্তিকা জ্বেলে মানুষের মুখ যাবে চেনা
কে ক্ষুধিত কাঁদে অন্নহারা
কে আছে লাঞ্ছিত ফেলে দীর্ঘশ্বাস
কে তুমি তাদের হয়ে তর্কাচ্ছন্ন করেছ আকাশ
কী অমৃত ঢেলে দেবে তোমাদের বাক্যসুধাধারা
প্রাণ যাতে পাবে প্রাণহারা ?
কূটতর্কে শান দেওয়া স্বর
অসমাপ্ত বিকৃত মুখর
আকাশ গলান সুর
বাতাসের রন্ধ্রগুলি ভরে
পূর্ণিমার ডাক দেওয়া প্রাণের জোয়ারে
স্পর্শ তো করে না আর চেতনার সীমা
উদগত উদ্ভিন্ন আশা
আলোকিত আত্মার মহিমা।
অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ভাগ
বিপর্যস্ত চিন্তার কারায়
চিত্তের অমৃত বর্তি প্রেম যে হারায়।
যে পথ দেখাতে চাও
সে পথ যে বাঁকা চোরা গলি
পরিশ্রান্ত দেহে মনে সাহস হয় না সেথা চলি।
খিন্ন আশা, বিশীর্ণ ক্লান্তিতে
কোথা সুর কোথা প্রেম হৃদয়ের ভাণ্ড ভরে নিতে ?
কোথা সেই অবসর, স্বর্গের আহ্বান
যেখানে ক্ষুধিত পায় সুধার সন্ধান ?

অসম্পূর্ণ মানবের চির অতৃপ্তির
শেষ হবে, দীপমুখে ভাস্বর দীপ্তির
চির প্রেম নিয়ে আসে শাশ্বত আস্বাদ
মানুষ হবার মেটে সাধ
সে পথ পাইনি আজও
দেহ তাই প্রাণহীন শব
তারি পরে নৃত্য করে চিন্তার তাণ্ডব।

১৯৪৬

বহির্মুখ

স্বপ্ন হয়ে এল ম্লান
ভুলে গেছি প্রেম কাকে বলে
জীবনের রাজপথে আজ যারা দলে দলে চলে
যৌবনের তরঙ্গিত রূপ তারা নহে
স্বেদ কম্প উন্মোথিত উন্মনা বিরহে।
তারা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত জীবনের জড়ত্বের দায়
অসীম বুভুক্ষা নিয়ে দাঁড়ায়েছে হৃদয় সীমায়।
দিনে দিনে ক্ষোভ হল জমা
খিন্ন ম্লান দৃষ্টির সুষমা
ব্যর্থ হল আকাশের অসীম আহ্বান
পরাজিত ঈশ্বরের স্বর্গীয় প্রমাণ।

মৃত্তিকার রসপায়ী অঙ্কুরের যে ঊর্ধ্বে উত্থান
আলোকের আলিঙ্গনে প্রত্যহ আনন্দ সুধা পান
প্রাণদায়ী সে মৃত্তিকা ধরিয়াছে প্রাণঘাতীরূপ
কঙ্করের চাপে নিঃস্ব কুসুমের সুগন্ধ স্বরূপ
কায়া হয়ে ওঠে বড় ঢাকা পড়ে অ-কায়ের ছবি
অব্রণ অশির শুদ্ধা হয়ে গেল
প্রচণ্ডা দানবী।
দাবি তার বহু মুখে ছোট বড় কাজে
ফেলেছে বিরাট জাল যুধ্যমান মানব সমাজে।
আকাঙ্ক্ষার লোলশিখা জ্বালাময়ী ক্ষুধা
প্রত্যহ আহুতি দেয় সর্বগ্রাসী বিশীর্ণ বসুধা।
চাই চাই বলে দেহ মন বলে কিছুই পাব না
প্রত্যহের দাবি জীর্ণ জটিল ভাবনা

পাথরের মত জমে, শীর্ণ করে
স্রোতস্বিনী-ধারা
পেলব চৈতন্য কান্তি তাপে তপ্ত নিত্য দিশাহারা।
কাঁদে প্রেম একাকিনী,
গোপনে নিভৃতে
আজ সে বিষণ্ণা ভীরু
শক্তি নাই নিতে বিশ্ব জিতে।
নিরন্নের ছিন্নকন্থা ঢেকেছে যে ঐশ্বর্যের জ্যোতি
বায়ুভূত নিরালম্ব আত্মার সদগতি।
অবিরত আকাঙ্ক্ষার জমা করা গ্লানি
স্বর্গের সম্ভার ফেলে ভিক্ষা চেয়ে ফিরিছে ইন্দ্রাণী।

কি দিব তোমারে ভিক্ষা হে আমার সত্তা জ্যোতির্ময়
অপাবৃণু অন্ধকার, চির অসংশয়
জড়ের প্রস্তর দীর্ণ রন্ধ্রচারী আলো
ধুম্রলীন এ প্রদীপে একবার শিখা তারি জ্বালো
বহ্নিমুখ উর্ধ্বগতি সে আলোক ক্রমে
চলে যাক ইন্দুরূপা জ্যোতিষ্ক সঙ্গমে।

১৯৪৭

যাঁহারা বসেছে ধ্যানে চিনেছে জগৎকে
দেখায়েছে নব পথকে
যাঁরা জানে মানুষের অকৃপণ আশা
কেন কাঁদে প্রেম, কেন আছে ভালোবাসা
কেন জ্ঞানে দিয়েছে সে চিত্ত অনন্য
এ আর্তি কেন তার অজানার জন্য
তারা বারবার এসে দাঁড়ায়েছে দ্বারে
বলেছে আপনি খুঁজে দেখো আপনারে
দেহের ভিতর দেখো চির দেহাতীতকে
প্রাণে পাও আপনার চির প্রাণজিৎকে
দেখো আপনার যোগ এ নিখিল বিশ্বে
মানুষে মানুষে আর অতীতে ভবিষ্যে
আপনার ছোট বড় আত্মগত সীমা
মুক্ত কর দেখো তব মানব মহিমা।
নিত্য মানবের সাথে চির যুক্ত সত্তা
হননের বৃত্তি তাই তব আত্মহত্যা।
যাঁরা জ্ঞানী যাঁরা ধ্যানী মানব মহৎ
বার বার তাঁরা এসে দেখায়েছে পথ
শুনেছি তাঁদের বাণী দিয়েছিও ভক্তি
বলেছি, হে গুরু লহ প্রেম অনুরক্তি
তবুও গোপনে রেখে শততিক্ত ক্ষোভ
শানায়েছে তীক্ষ্ণ ছুরি স্বার্থগত লোভ
ছোট যাহা তারে দিয়ে বড় বড় নাম
বাড়ায়েছি আপনার দাম—

শিশুর ক্রন্দন ধ্বনি, ধর্ষিতা যে নারী
ভ্রাতৃরক্ত কলুষিত হীন তরবারি
মুমূর্ষুর মৃত্যু আর্ত প্রাণ
আজ তাঁহাদের করে চির অসম্মান।
ভীরুর হৃদয়ে যাঁরা জাগায়েছে বীরকে
তুলেছিল পতিতের অবনত শিরকে
তপস্যার কান্তি দিয়ে পাপ করে দীর্ণ
মানুষের পশুদেহে দেব অবতীর্ণ
নিহতের মূক কণ্ঠ কয়
তাঁহাদের আজ পরাজয়
কপট ছুরিতে আজ বীরের বঞ্চনা
লাঞ্ছিত নারীর দেহে তাঁদেরই লাঞ্ছনা

১৯৪৭

ঊর্ণনাভ

যে মনে উদাস হল অনন্ত
যে মনে হেসেছে কত বসন্ত
যে মনে বর্ষা ধারা বয়েছে
যে মনে জ্যোৎস্না চেয়ে রয়েছে
যে মন দুঃখ সুখের লীলাতে
চেয়েছে জীবনধ্বনি মিলাতে।
চেয়েছে অকস্মাৎ বারে বার
আপন সীমা রেখা হতে পার
যে মনে ক্রন্দসী বন্ধনে
জড়াল জীবনের ক্রন্দনে
সমুদ্র চঞ্চল চেতনায়
ঝঙ্কৃত অস্ফুট বেদনায়।
যে মনে বিস্মিত গ্রহ তারা
ভাবনা উন্মনা দিশাহারা
যে মন দেখেছে কত অ-দেখা
অ-ছোঁয়া অ-ধরা ভাব অ-লেখা
দেখেছে উদ্গত পল্লবে
আপন হৃদয়ের বল্লভে।
বিশ্বের অজানা এ বিস্ময়
যে মনে প্রত্যহ ছুঁয়ে রয়
সে মন হারায়ে গেছে পথ তার
পার হতে ক্ষুদ্র এ সংসার।
ছোট খাট কত গলি ঘুঁজিতে
সে আজ রয়েছে কারে খুঁজিতে

যে রাগিণী পুরে ওঠে এ জীবন
ঝরেছিল ভরে এই ত্রিভুবন
সে রাগিণী ভুলে গেছে সুর তার
পদে পদে প্রতিহত ঝঙ্কার
খণ্ডিত হয়ে গেল ললিতা
যে শিখা জ্বলিবে তার সলিতা
ধূম্র-বিলীন হল ছায়াতে,
প্রত্যহ তুচ্ছের মায়াতে।
যে সত্য মর্মের গভীরে
এঁকেছিল স্বপ্নের ছবিরে
সে ছবি পড়িয়া গেল ঢাকা হায়
অযোগ্য কত শত ঘটনায়
যে সুরটি স্পন্দিত আয়ুতে
স্বর্গ ও মর্ত্যের বায়ুতে
সেই সুর একতারা বাজিয়ে
ফিরিছে ভিক্ষা ঝুলি সাজিয়ে
তুলিছে ক্ষুদ্র টানা-পড়েনে
ঊর্ণনাভের মত দোলনে।

১৯৪৭

যুদ্ধোত্তর

শ্রীহীন এ জীবনের বিনষ্ট ভূমিকা
ব্যাপ্ত হল মৃত বিশ্বময়।
শুধু অন্ন আর কিছু নয়।
শুধু প্রাণ ধরে রাখা নির্জীব জীবনে
কলঙ্কিত শূন্য দেহে মনে।
যে প্রাণ চেষ্টায়
জেগেছিল সরীসৃপ একদিন এই মৃত্তিকায়
স্থূল চর্ম, জিহ্বা লোল গ্রীবায় উদগ্রীব
অরণ্য মন্থন করে দীর্ঘকায় জীব
খুঁজে ফেরে খাদ্য তার। ভাষাহারা প্রাণ
অব্যক্ত নিষ্ঠুর ধ্বনি শুধু স্পন্দমান।
উন্মোথিত দেহ ব্যাপ্ত ক্ষুধা
তারই রসে জীর্ণ করে রসময়ী তরুণী বসুধা
জন্মেছে আদিম জীব।
সর্পিণীর সে সান্নিধ্য ভার
সৃষ্টির কুটিল নক্রে মূঢ়তার শত অত্যাচার
সয়েছে মেদিনী।
জেনেছে সে তমিস্রা ছেদিনী
আশ্চর্য নক্ষত্র-লোক একদিন আবির্ভাব হবে
মনোময় চেতন উৎসবে।
প্রেমের গোলাপে দিয়ে দোল
পাখি তাই ডেকেছিল ডালে
আকাশের রঙ-ছবি সন্ধ্যায় সকালে
কত লক্ষ যুগ ধরে প্রতীক্ষায় তার
অহল্যা মাটিতে এল শস্যের জোয়ার—

স্নায়ু শিরা ধমনীতে দীপ্তি উদ্ভাসন
প্রজ্ঞাময় মানুষের মন
সূর্য চন্দ্র আবর্তিত নির্দিষ্ট এ পথে
দেখা দেবে একদিন জড়ের জগতে।
শুধু আর অন্ন নয়, শুধু নয় দেহমগ্ন ক্ষুধা
অনিন্দ্য এ সম্ভাবনা আশা হয়ে ভরেছে বসুধা।
সৃষ্টির যে সুগন্ধ নিঃশ্বাস
আলো হয়ে, রাত্রি হয়ে কভু হয়ে বসন্ত বাতাস
উদ্ভিন্ন করিবে সেই মন
স্বর্গজয়ী চৈতন্যের অতুল্য ভুবন।

তপশ্চারী সে মানুষ শীর্ণ করে কায়
পৃথিবীর তপস্যাকে নিয়েছে আপন তপস্যায়।
জ্বলেছে সে প্রদীপ্ত হৃদয়ে
ব্রতচারী অগ্নিসন্ধ হয়ে।
ভেঙে দেহ শৃঙ্খল বন্ধন
অন্তরের উৎস মুখে উৎসারিত আত্মার ক্রন্দন
কিসের সাধনা তার কী তাহার অশেষ জিজ্ঞাসা
কেন মূক ত্রিভুবন তাহার চৈতন্যে পেল ভাষা,
কেন তার সর্ব ত্যাগ, কেন তার বীরত্বের জয়
কেন তার প্রেম স্পর্শ স্পন্দিত হতেছে বিশ্বময়?
বিজয়ী পৌরুষ তার কিণাঙ্কিত বাহু
লোভে ক্ষোভে গ্রাস করে রাহু
সপ্রশ্ন হৃদয়ে ফেরে পায় না উত্তর
বিশ্বের হৃদয়োত্থিত বিশ্বানুভূ নর।
সে জানে এখনই তার এখানে কখনো নহে শেষ
দীর্ঘ দূর পরিক্রমা পথ যার আজও নিরুদ্দেশ

সংগীতে ঝংকৃত সেই পথ খোঁজে জ্ঞানে
বেদনা উৎকীর্ণ গতি চলেছে সে পথের সন্ধানে
ব্যোমচারী আনন্দে উন্মন
বাধা হয়ে ওঠে তার মূঢ় এ পৃথিবী অচেতন।
চেনে না নিজের সৃষ্টি ধ্বংস আনে অজ্ঞাত আক্রোশে
চেতনা এসেছে কেন অচেতন এই বিশ্বকোষে
দেহ ব্যাপ্ত জড় বাধা, বাধা আছে ক্ষুধার শক্তিতে
অলৌকিক সুধাপাত্র চূর্ণ করে দিতে—
সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা নিয়ে লোভ তাই বাড়ায়েছে গ্রীবা
ক্রোধোন্মত্ত লেলিহান জিহ্বা
ঈর্ষা করে উন্মত্ত তাণ্ডব
গুহাবাসী অতিকায় অদিম দানব
জেগে উঠে আত্মারে করিবে ভগ্নস্তূপ
ভেঙে যাবে মানুষের সদ্যোজাত ধ্যানমগ্ন রূপ
দুর্ভিক্ষের দারিদ্র্যে তাই করে হানাহানি
স্বার্থমত্ত স্থূলকায় প্রাণী
বীর্যহীন ক্ষীণ আত্মা কাঁপে
আত্মঘাতী পৃথিবীর করুণ বিলাপে।

১৯৪৭

পঁচিশে বৈশাখ

তোমারে কি কথা দিয়ে স্পর্শ করা যায়
তোমারে ধারণ করি জীবনের নিভৃত সীমায়
যেখানে চিন্তার আলো তব
সূর্যালোক সম গড়ে প্রাণ নব নব
নব শক্তি নব অনুরাগ
আনন্দ ছন্দিত মন্ত্রে ধরিত্রীর ললিত সোহাগ
সাগরের গভীরে ও পর্বতের উচ্চ উর্ধ্ব লোকে
প্রান্তরের মহিমায় বনানীর শ্যামল পুলকে
ছোট ছোট চাওয়া পাওয়া স্নেহে সুখে গড়া
যে আকাঙ্ক্ষা প্রত্যহের আলো ছায়া ভরা
কাঁপে শঙ্কান্বিত
মানুষের জীবনের উত্তাপে তাপিত
তুলে তার সহস্র অঙ্কুর।
মূঢ় আর্ত চিত্ত হতে অনির্দিষ্ট সুর
তারে তুমি কি দিলে রাগিণী
অচেনা যা মনে হল চিনি
অশ্রুত যা কানে তাহা বাজে
নয়নে কি জ্যোৎস্না ধোয়া লাবণ্য বিরাজে
হে কবি, তোমার স্পর্শ তোমার অস্তিত্ব
প্রাণকেন্দ্রে হয়ে উদ্ভাসিত
সুখ স্বপ্নছায়া ভরে, চোখে পুষ্প পেলব সুষমা
শান্ত ক্ষোভ পরিপূর্ণ ক্ষমা
পরাভূত পেয়েছ সম্মান
হে স্বর্গীয় তোমার আহ্বান

কোন দিব্যলোক হতে চৈতন্যের কেন্দ্রে লাগে এসে
এ লাঞ্ছিত দেশে
যাহা কিছু পথভ্রষ্ট অসার্থক দীন
অপমানে পরিক্লান্ত বিশীর্ণ মলিন
তারে তুমি বীর্য দিলে, কণ্ঠে দিলে বিদ্রোহীর ভাষা
মুমূর্ষুর জীবনের আশা
হে নর, হে নরোত্তম, দেবাদর্শে গড়া
তোমার উদয়ালোকে উদ্ভাসিত ধরা
ঊর্ধ্বে যবে চেয়েছিল সুপ্রসন্ন সুখে
পরিপূর্ণ মানবের চিহ্ন ধরে বুকে
পথপ্রান্তে বসে যারা দেখেছে সে জ্যোতি
সে গানে মুখর যার জীবন আরতি
তাহাদের প্রাণে গেছে মিশে
পঁচিশে বৈশাখ আর শ্রাবণ বাইশে
সময়ের স্রোত হতে বৎসরে বৎসরে
সে অখণ্ড অতীত কি গতি স্তব্ধ করে
স্পর্শ করে প্রেম অন্তর্লীন
নেবে পূজা নেবে এই আনন্দ রঙিন।

১৯৫০

ভাষা

নীল চক্ষু মানুষের কণ্ঠে
ধূমপ্লাবিত সরস্বতীর কলধ্বনিতে
দেবী বাক্ মন্ত্র সম্ভবা
জ্যোতিষ্কের সভা থেকে চ্যুত
আকাশ-গঙ্গার মত
অলক্ষ্য অবিরত। ধারা তার
বয়ে নিয়ে আশ্চর্য সম্ভার
হৃদয়ের রন্ধ্রচারী গোপন ভ্রমণে
মনে মনে নিতান্ত অহেতু
বেঁধে চলে সেতু।

এতে কি রহস্য নেই ?
যে নদী, সেতু সেই
যে প্রবাহিত প্রত্যহ অজ্ঞাত পথে
সময়ের অদৃশ্য জগতে
সেই নদী বার্তাবহ
ঊর্ধ্বোত্থিত চিত্তমুখে সংবেগে দুঃসহ
পাথরে ভঙ্গুর পথে ফেনায়িত গতি
নদী সরস্বতী।

যে মন মাটিতে চাপা বোবা ভাবনায়
যে আত্মার মূঢ়ধ্বনি
জন্তুর কান্নায়
ক্রমে ক্রমে সেই আর্তনাদে
ভরেছে সে আশ্চর্য সংবাদে

গড়েছে সে মানুষের মন
দেহহীন ছায়াহীন সুরের ভুবন।
সে সরস যদি ফল্গু হয়
অহল্যা মরুতে কাঁদে
মানুষের ব্যর্থ পরিচয়।
যে কথা শোনাতে চাই যুগ যুগান্তর
মাটিতে পাথরে লেখা বোবা কণ্ঠস্বর
যে আমার স্পর্শহারা আশা
তোমার হৃদয়ে দেবে ভাষা
অখণ্ড অনন্ত ধ্বনি তারি
স্বর্গচ্যুত জহ্নুকন্যা শুভ্র প্রজ্ঞাবারি
চিন্তার আবর্তে দিয়ে পাক
মন্ত্রোদ্ভবা স্রোতস্বিনী বাক্
ভেদ করে কত কাঁদা হাসা
ঠেলে বাধা
চলে দূরান্তরে
মানুষের অন্তরে অন্তরে
মানিকে খচিত কথা বলা
সুন্দরী প্রবলা।

ঋষিকে দিয়েছে জ্ঞান
দৃষ্টি অন্তর্মুখী
প্রিয়কে করেছে সুখী
ইন্দ্রজাল বিছান ভাষায়
কান্নাকে করেছে গান
কত শোক ভরেছে আশায়

বঞ্চনার ছুরি বেঁধা রক্তস্রোতে পশি
কামনাকে করেছে উর্বশী
কত রূপে রূপে গাঁথা
নানা রঙ্গা স্রোতে
মানুষের মুখর জগতে
শব্দে আর অর্থে মিলে লীলা
মন্ত্রময়ী হে অদৃশ্যা ইলা
ধরা দাও ভাষার বন্ধনে
যুগ যুগ পার হয়ে
নিঃশব্দ চরণে।
সজ্জিত নূতন আভরণে
তোমার প্রবহমান অখণ্ড স্বরূপ
গড়ে তোলে মানুষের সর্বগামী রূপ

জীবন প্রত্যুষে তার বোবা চিত্তে পশি
স্পন্দিত ক্রন্দসী।
সে ক্রন্দন আজো নেমে আসে
শব্দময় ছড়ানো আকাশে।
নূতন বসন পরা নবীন ভঙ্গিমা
অর্থের বন্ধনে বাঁধা ছোট ছোট সীমা
কত যুগ হয়ে এসে পার
ধ্যানময় মনোলোক তোমার আমার
ভরে তোলে প্রাণের নিঃশ্বাস
অন্তর্গূঢ় স্তব্ধ ইতিহাস—
উদ্ভিন্ন বীজের মত অচৈতন্য অন্ধকার হতে
ডেকে আনো ভাবের জগতে

জ্বেলে দাও দীপ শত শত
তারাময় আকাশের মত
মনের মিছিল নিয়ে
অখণ্ড অছিন্ন প্রজ্ঞামতী
মন্ত্রোস্তবা দেবী বাক্
বেগময়ী দেবী সরস্বতী।

১৯৫০

স্মৃতি

প্রেমের কবিতা পড়ি নির্জনে
প্রেম কি তা মনেও পড়ে না
চৈত্রের হাওয়া লাগা ফুল বনে
জ্যোৎস্না গলান সুখ ঝরে না।

জানি না বেপথুমতী হর্ষে
রোমাঞ্চে কাঁপে কার দেহ মন
অলক্ষ্য চুম্বক স্পর্শে
মন্থিত হয় কেন যৌবন।

জানি না অমরাবতী কোথা হায়
অমর্ত্য সুধা নিয়ে পাত্রে
পথহারা মানুষেরে নিয়ে যায়
তারা-খচা স্বর্গের রাত্রে।

আমার এ চারিদিক ঘিরে যে
ছোট বড় কালো কালো চিহ্ন
চাওয়া-পাওয়া পাক দিয়ে ফিরে যে
স্বপন মাধুরী করে ছিন্ন।

কত আশা নিরাশার আঁধারে
ছায়াময় জীবনের প্রান্তে
কোথায় কি সুখে আছি বাঁধারে
আজও তা পারি নি ভালো জানতে

তবু সেই গূঢ় নীল অতলে
যেমন কয়লা গাঁথা খনি
স্মৃতির হীরার আলো জ্বলে
গোপনে লুকানো কোনো মণি।
ধাপে ধাপে নিচে নেমে গেলে
কূপ যেথা অন্ধকারে ঘন
ছোট ছোট স্মৃতি দীপ জ্বেলে
আছে সাদা পাথর ছড়ান।

১৯৪৭

প্রথম প্রীতি

বিকৃত নগরী জনতার চাপে
কখনো বা পাপের প্রতাপে
ক্ষুধার্ত্তের আর্ত্তনাদে
মৃত্যুময় ফাঁদে, জড়িয়ে আছে
কেন এরা বাঁচে
অলিতে গলিতে
ক্লেদে মগ্ন, ভগ্ন নিরন্ন অঙ্কে
মৃত্যু পঙ্কে
নূতন শিশু আসে ?
তারা-হাসে
কখনো বা কান্নার কল্লোলে
ঢেউ তোলে।
তারা তো জানে না
উঁচিয়ে আছে সঙ্গিন
বাজছে দামামা
ঐ যে কত রঙিন
চাওয়ার হাওয়ায় মাতাল
লোভের পাতাল
ওরই বিকৃত বিবৃত গ্রাসে
পুরে নিতে আসে
হাসি কান্না গান
তবু প্রাণ
পঙ্ক বদ্ধ মৃণালের বুকে
কি কৌতুকে

চেয়ে চেয়ে দেখে
বলে এ কে ? সে কে ?
ও কেন ? সে কেন ?
আমাকে কি চেন ?
কেন আছি ?
তপ্ত গ্রীষ্মের দীর্ঘশ্বাসে
শুকনো বাতাসে কেন বাঁচি ?

চির প্রশ্ন কাঁদে জীবনের খিন্ন ভূমিকায়-
করে হায় হায়
ক্লিষ্ট আয়ু
যেমন ঘূর্ণি বায়ু
ছিন্ন করে আনে
বৃক্ষে গাঁথা, পুষ্প পাতা
তেমনি ছেঁড়া জীবনের ফাঁদে
শত প্রশ্নে কাঁদে
অস্তিত্বের বাণী
কি চাই, কি জানি ?
চেয়ে দেখি বারে বারে
ধূম্রলীন গলির আঁধারে—
ছাতের আলসে পরানো
ভাঙা আকাশের গায়ে
স্বর্গের আসনে আরূঢ়া
রক্ত কৃষ্ণচূড়া—
সে বলে এদিকে ফিরে চাও
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে যাও

সে বলে এ চির শর্তে
অস্তিত্বের খেলার আবর্তে
হাসে তারা, জ্বলিছে সবিতা
তোমার প্রাণের স্পন্দে
লিখে নিতে একটি কবিতা।

১৯৫০

মানুষ

একদিন ভেবেছিলাম মানুষকে জানব
মানুষের শত্রুকে হানব,
মানুষের কাছে আসব
তাকে ভালোবাসব।
এ সংকল্প নূতন নয় তা জানি
এই তো এ যুগের বাণী
যুগের এই সত্যে
সত্য হব গভীর আনুগত্যে,
কিন্তু হায়,
যতই দিন যায়
দেখি যতই চাই না
মানুষকে তো পাই না
পথচারী জনতার এই ঢেউ
আমার তারা কখনই নয় কেউ
দেখতে পাই না চির মানব মনকে
দেখি শুধু আত্মীয় স্বজনকে,
মাতা পিতা ভ্রাতা ভগ্নী সম্বন্ধ নিচয়ে
শত ভগ্ন হয়ে
বেদনার বুদবুদের মত
মনে মনে শত শত
শিথিল গ্রন্থিতে
বাঁধে আর খোলে আচম্বিতে।

যে পাবক মেলে দিয়ে বহ্নিমান শিখা
যেতে পারে জ্যোতির্লোকে

ক্ষণে ক্ষণে হয়ে নীহারিকা
অন্তর্গূঢ় সেই দিব্যদাহ
সম্পর্কের আবর্তনে বিচ্যুত প্রবাহ
নেমে আসে মুহুর্মুহু
ভবানীপুরের এই প্রথম গলিতে
বান্ধবের কানে কানে গোপনে বলিতে
কত নিন্দা বিষমুখ
কত তীক্ষ্ণ বেদনা অঙ্কুর
বিপন্ন যে ভালোবাসা
যে ঈর্ষা নিষ্ঠুর
মনে দেয় যন্ত্রণার পাক
তার জন্য আছে ঐ বাঁধানো রোয়াক
যেখানে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে
মাথার তৈলাক্ত ছাপ
নিশ্চিন্তে লাগিয়ে
বসে আছে কৌতুহলী সখী
কানে কানে শোনে আর
মনে মনে ভাবিছে কত কি
ভাবনায় মিশে যায় কটু তিক্ত কষা কত স্বাদ
সমব্যথা হয় নাতো একেবারে শুভ্র শূন্য খাদ।

খিড়কির দ্বার খুলে নামি তাই আশ্চর্য জগতে
মুক্ত চিন্তা মুক্ত মনোরথে
যেখানে মিছিল চলে,
নেতা জ্বালে মশালের আলো
সেখানেও মাঝে মাঝে,
ছায়া কালো-কালো

ক্ষয়ে যাওয়া রাজপথে
ছদ্মবেশে লুকানো গহ্বরে
আত্মার মারণ মন্ত্র পড়ে।
কখনো গৈরিক বেশ
কখনো বা পৈতায় পেঁচানো
ফন্দির বঙ্কিম অস্ত্রে
শক্তিশেল হানো।
তবুও মিছিল চলে
কভু ধীরে কভু ঊর্ধ্বশ্বাস
মানুষের ডাকে তার
এখনো হয়নি অবিশ্বাস
শহুরে গলিতে যেন ঊষার প্রথম অভ্যুদয়
দ্বিধায় কম্পিত আর হারানো প্রত্যয়
ইটের দেওয়ালে গাঁথা জীর্ণতার ফাঁকে
যেমন অশ্বত্থ তার পাতা মেলে রাখে
সবুজ প্রাণের রসে ভরা
সূর্যের একান্ত মনোহরা
তেমনি মনের কোণে—ক্ষীণ আশা
দুর্বল ভঙ্গুর
মাঝে মাঝে ঊর্ধ্বে তোলে
প্রাণতপ্ত স্বর্গগামী সুর।

১৯৫০

গবাক্ষ

ছোট ঘর,
জানালা দিয়ে দেখা যায় দূর দূরান্তর—
পার হয়ে মাঠের সীমানা
অরণ্যের নীলিম রেখায়
অজ্ঞাত রহস্য লেখা অজানা জীবন মোহানায়
দৃষ্টি পড়ে। দৃষ্টি পড়ে অদৃশ্য জগতে
আমার এ বদ্ধ কেন্দ্র হতে
ছোট ছোট কৌতুহল, জোনাকীর মত পাখা মেলে
উড়ে পড়ে মনের দেওয়ালে
যে বিশ্ব দেখিনি আমি
অজ্ঞাত যে এ তিন ভুবন
তারই কোন মধ্য আকর্ষণ
মুহুর্মুহু লাগে রক্তস্রোতে
ঐ ছোট গবাক্ষের রন্ধ্রচারী বায়ু
নিয়ে আসে, স্পর্শ করে আয়ু
সমুদ্রের হাওয়া লাগে পার্বত্য শীতল
গায়ে লাগে হিমগলা নির্ঝরের জল
যা দেখিনি দেখি তাও, দৃশ্যের জগত
সত্য হয়ে ওঠে পেলে এতটুকু পথ।
ঘরের জানালা আছে
দেহের কি নেই ?
কঙ্কালে শিরায় গাঁথা সেই
দুর্গের গভীরে, দেখায় যা মনের জগত
অকায় অব্রণ নয় শত শত মত

ছোট বড় তুলে কুশাঙ্কুর
অগম্য অজ্ঞেয় যাত্রা করেছে বন্ধুর।
তাই আজও রয়েছে অজানা
আত্মগত শত সম্ভাবনা
জানি না এ দেহের আধারে
বারে বারে কি জাগিতে পারে
কি কামনা কি বেদনা কি ভালোবাসায়
কি অভাবনীয় আছে চির প্রতীক্ষায় ?
জানি না আমার রক্ত, আমার ধমনি
কি শক্তি বহন করে চলে গনি গনি
দিনক্ষণ মুহূর্ত সময়
এতটুকু রন্ধ্র পেলে আত্মপরিচয়
সমুদ্রের বেগ নিয়ে যৌবন কল্লোলে
চেতনা উত্তপ্ত করে তোলে
সভয়ে মুহূর্তে রুধি গবাক্ষের দ্বারে
আমার রহস্য সাথে পরিচয় হয় না আমার।

১৯৪৭

প্রশ্ন

একদিন যারা ছিল পাশে
যাদের চোখেতে রেখে চোখ
বড় ভালো লেগেছিল শীত বর্ষা গ্রীষ্মের প্রকোপ
সকাল সন্ধ্যার রং জ্যোৎস্না কিংবা কালিন্দী যামিনী
যাদের নন্দিত স্পর্শে সত্ত্বা হল সমুদ্রগামিনী
এ প্রশ্ন শুধাব কার কাছে
তারা আজ কোথাও কি আছে !

প্রেম নাকি মৃত্যুঞ্জয় ; ভালোবাসা স্বর্গীয় অমর
তবু তার কণ্ঠে কেন মাঝে মাঝে বাজে ভগ্ন স্বর
কেউ ক্লান্ত হয়ে গেল পথ রৌদ্র দাহে
কেউ ভেসে গেল দূরে পার হয়ে মৃত্যুর প্রবাহে
এ প্রশ্ন শুধাব কার কাছে
তাদের সে সত্য কোথা আছে ?

ইন্দ্রিয় উত্তাল করা এ রক্তের ধারা
সুধার সমুদ্র তোলা সে চোখের তারা
মুছে গেল হারাল সে হৃদয় স্পন্দন
সব আছে শুধু নেই স্বর্গ ছোঁয়া মন।
পৃথিবী আপন কক্ষে ঘুরে চলে শব্দহীন পায়ে
আবাহনে বিসর্জনে বরণে বিদায়ে
অন্তর্মূলে, দেহে মনে, বারংবার ঢুকে
পাক দিয়ে নিয়ে চলে পিছনে সম্মুখে
প্রশ্নহীন চোখে শুধু শূন্যে চেয়ে রই
মনে ভাবি আমি সেই, তবু জানি আমিও সে নই।

১৯৬২

সুরের এক সমুদ্র আছে
শুনতে পাই নি,
তার তীরে যাই নি
আমার এ দিনে রাতে
শব্দের সংঘাতে
বেজে ওঠে আঘাতে প্রচণ্ড
ধ্বনি খণ্ড খণ্ড।
যখন পাহাড়ের চূড়া খসে পড়ে
নিচের গহ্বরে
মেঘে মেঘে বজ্র বেগে ঝঙ্কার নির্ঘোষে
ক্ষিপ্ত রোষে
মারুতের লীলা
নিষ্ঠুর দুঃশীলা
তখন সে শব্দের সাগরে
শুনেছ কী প্রহরে প্রহরে
কোনো তান, কোনো গান ?
যখন সমুদ্র ডেকেছে নদীকে
পথের ওদিকে
উন্মূলিত তরু ভেঙে পড়ে
ঘূর্ণিত নির্ঝরে
সে উত্থিত প্রলাপে মাতাল
বেজেছে কি তাল
শুনেছ কি সুর
চকিত বা মধুর ?

যখন মানুষের জগতে
নানামতে যুদ্ধের হুঙ্কার
অমোঘ গর্জনে
শহরে অরণ্যে
রুদ্ধস্বরে কখনো বা উচ্চ আর্তনাদে
পাতা হয় মৃত্যুময় ফাঁদ
তখন সে অট্টরোলের গোপনে
মানুষ কি কান পেতে শোনে
অজ্ঞান এ শব্দের নিখিলে
অখণ্ডিত মিলে
প্রচণ্ড প্রচুর—বাজে সুর।
যখন সৃষ্টির প্রথমে
উল্কার বিক্রমে,
প্রাণের ঘোষণা, গেল শোনা,
বিশ্বের ধ্বনিতে
জীবন শোণিতে
প্রান্তরে সমুদ্রে, জৈবযুদ্ধে
হল জমা
বাণী নিরুপমা।
সেই অখণ্ড রাগিণী কত শব্দে
নানা দেশে নানা অব্দে
মানুষ বাজালে, মৃদঙ্গ কিংবা বীণা
আফ্রিকার জঙ্গলে
বাজল ঢাক আর শিঙ্গা।
কত হুঙ্কার গর্জনে
স্পন্দিত প্রচুর
শব্দ হল ক্ষণে ক্ষণে সুর।

মনে পড়ে সংগ্রাম মথিত
সেই অগ্রথিত
অদেখা বিশ্বের নাম
যেথা বাঁধা আছে সপ্ত গ্রাম
যে পথ সন্ধানে
মানুষের প্রাণে
অমিলের মিলে
হাসি আর অশ্রুর সলিলে, গ্রথিত গ্রন্থিত
ঈর্ষা দ্বেষ প্রেম আর আনন্দ মন্থিত
ধ্বনি ওঠে। বলে—আমি ভিন্ন নয়
বাঁকা যাহা তা নয় বিকৃত
নিখিলের চির শর্তে সব ধ্বনি
রয়েছে স্বীকৃত·· ···
সুরে বাজে বসন্ত বাহার
শোনে কবি অন্তরে তাহার
গলিত লাভার শব্দ
আগ্নেয়গিরির মন্দ্র
আবর্তিত অখণ্ড কৌতুকে
ঝরে পড়ে সমুদ্রের বুকে
প্রচণ্ড উন্মনা।
আত্মার দুর্জয় বেগ
সেখানেও তবু যায় শোনা······
যা উন্মত্ত যাহা রূঢ়
এমন কি যাহা ক্রূরও
সেখানেও ধ্বনিত স্পন্দিত
নিখিলের সুর তরঙ্গিত।

.৯৬২

মৃত্যু

বসেছি মৃত্যুর প্রতীক্ষায়
মাথার কাছে খোলা জানালায়
অবগূঢ় অন্ধকার মাখা
উঁকি দিচ্ছে বৃদ্ধ আম্রশাখা
সহস্র পল্লবের ফাঁক দিয়ে
পশ্চিম আকাশের আঙ্গিনা ডিঙিয়ে
একটু বাঁকা আলো
পড়েছে খাটের উপর
স্বজনে ভরে গেছে ঘর
কে কত স্বজন
তাহারই প্রামাণ্য প্রয়োজন
উৎকণ্ঠা তড়িত আর মৃত্যুহত হয়ে
চেয়ে দেখে অনিবার্য প্রাণের বিলয়ে
রোগশয্যা কেঁপে ওঠে
দীর্ঘ নাভিশ্বাসে
মৃত্যুর অমিত শক্তি
গ্রাসের উল্লাসে
নাড়া দেয় স্পন্দমান দেহ,
নত দীপ, রিক্ত আলো
আতঙ্কিত স্নেহ।
সতর্কিত পায়ে চলা
রুদ্ধবাক স্বরে
অপেক্ষাকে দিক্ ভ্রষ্ট করে।
যে আমার এত প্রিয়
একান্ত আপন

কত সুখ দুঃখ দিয়ে
ভরেছিল প্রত্যহের মন
আশ্বাসে বিশ্বাসে ভরা
প্রেম পরিশ্রুত
অবিলম্বে হবে বায়ুভূত।

সন্ধ্যা দীর্ঘতর হয়
রাত্রি হয় ঘন
হাতে আছে সময় সামান্য
প্রলম্বিত শ্বাস শব্দ নিস্পন্দ এ ঘরে
ঘণ্টা বাজে প্রহরে প্রহরে।
কাঁদে পত্নী প্রচণ্ড বিলাপে
শোকে কাঁপে,
সন্তান সন্ততি
ক্ষুরধার প্রচণ্ডা নিয়তি
বিবসনা করে দেবে সজ্জিত সংসার
ছিন্ন ভিন্ন স্বর্ণ অলঙ্কার।
মুমূর্ষু জিজ্ঞাসু চোখে চায়
মৃত্যু কাঁপে তারায় তারায়
কথা বল কথা বলে যাও
একবার এদিকে তাকাও
কোলাহল কাঁদে দিশাহারা
উন্মুখ পাহারা
করে হায় হায়
কভু চলে, কভু বসে, স্থির প্রতীক্ষায়
আশা নেই ফিরিবার
কৃতান্ত যে একান্ত নির্মম

কখন পড়েছে ঘণ্টা
ট্রেন তবু ছাড়ে না প্ল্যাটফর্ম

কথা সব বলা হয়ে গেছে
হয়ে গেছে বিরহ বিলাপ
জানি তো এ জন্মভরে তপ্ত রবে
বিচ্ছেদ সন্তাপ
শুধুই বোকার মত চাই
গাড়ি তো বলেছে যাই যাই
তবুও যায় না
আশাহীন এ প্রতীক্ষা
কোনো যার অর্থই হয় না।
দীর্ঘ দীর্ঘ সুদীর্ঘ মেয়াদে
ধৈর্যের সমুদ্র ভরে
বিন্দু বিন্দু খিন্ন অবসাদে
থেমে আসে শেষ স্পন্দ
নিরালম্ব আয়ু
নিরাশ্রয় ব্যোমচারী বায়ু
কেঁদে ওঠে তীব্র ক্ষিপ্র স্বর
স্তব্ধ শোক বল্গাচ্যুত উন্মত্ত মুখর।

বৈধব্য যে নিদারুণ
প্রেমও তো কতই প্রবলা
জন্ম জন্ম সম্বন্ধের চির সত্য বলা
বিশ্বাসের দ্বার ভেঙে
উচ্চকিত রব
শ্মশান সন্ধানে চলে শব

লুণ্ঠিত অঞ্চল তুলে
বিধবা কাতর চোখে চায়
কে জানে চাবির গোছা
জ্ঞাতি শত্রু লুকাল কোথায় ॥

১৯৬২

অমোঘ

জ্যোৎস্নার অগাধ ঢেউ
কেরোসিনের ধুমে পড়ল ঢাকা
বিলুপ্তির অন্ধকার মাখা
ম্লান হল তারা জ্যোতি
সেই ক্ষতি
করেছে বিনিদ্র এই চোখ
এ যে মৃত্যু শোক।
মৃত্যু হল মহামানবের
মানব প্রেমের ভিক্ষু
সুগত যে সে বোধিসত্ত্বের
মরে যাবে শ্রীচৈতন্য
শ্রীরবীন্দ্রনাথ
মানুষ আবার হবে
নিঃসঙ্গ অনাথ
লোভের উদগ্রীব গ্রীবা তুলে
কার ধ্বংস খুঁজিছ সমূলে
লাঞ্ছিত মানববৃত্তি
প্রীতি নির্বাপিতা
উত্তপ্ত বারুদে জ্বেলে
আত্মঘাতী চিতা।

হে মোহান্ধ চীন
আর কি কখনো পাবে
তোমার সে দিন!

জ্ঞানের অমিত লিপ্সা
অতিক্রান্ত উত্তুঙ্গ তুষার
কৃতাঞ্জলি হে বিদ্যার্থী
দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াবে আমার ?
রক্তমাখা মাটি নয়
মানুষের সত্য অধিকারে
আমার পরম ধন
নিয়ে যাবে তোমার ভাণ্ডারে
তারি প্রতীক্ষায় আছি
আমি শত্রুজিৎ
তোমার অস্ত্রের চেয়ে
অমোঘ যে আমার সঙ্গীত
ধূম্রলীন দীপ হতে
আমি তাই ঊর্ধ্বে দৃষ্টি তুলে
আকাশে যে জ্যোৎস্না আছে
সেকথা যাব না আর ভুলে ।

১৯৬২

সভামঞ্চ

বসে আছি মঞ্চ বাঁধা সভার প্রাঙ্গণে
পড়ছে মনে
এই তো কদিন হয়
এ জায়গাটি ছিল জলময়
মাঝে মাঝে হচ্ছে ধানের চাষ
বেগুন ক্ষেতে মুলোর ক্ষেতে
গজিয়ে আছে আ-নিড়ানো ঘাস
ছোট ছোট নিকিয়ে নেওয়া দাওয়া
কঁচি শশার বাঁকা লতা বাওয়া
খড়ের চালে চালকুমড়োর
প্রসাধনী মুখ
ইটের ঠোকর খাওয়া চোখে
ভরছে স্বর্গসুখ।
মাঝে মাঝে একটি দুটি সিমেন্ট দিয়ে মোড়া
সৌধ শিখর ধনের কেতন ওড়া
দাঁড়িয়ে ছিল যেন আগন্তুক
তারি প্রতি সপ্রশ্ন কৌতুক
চিহ্ন রেখে যায়
লাঙ্গল আঁকা দাগে দাগে
প্রসন্ন রেখায়—
আজ সেখানে ঘরের পরে ঘর
উন্মূলিত ধানের ক্ষেত আর
সফলা প্রান্তর
ভরে গেছে লোকের পরে লোক
ঘর হারানো দিশাহারা বুকের মধ্যে শোক।

অড়হর ডাল আর বেগুন উচ্ছে মুলো
পায়ের চাপে ধুলো
আমের বাগান কেটে হল কাঠ
জমা জলের পঙ্কে পঙ্কে ভরে উঠল মাঠ
শত শ্বাসের বিষবাষ্পে
সঞ্চারিত পাপ
নগর এ নয় মৃত্যু অভিশাপ।
তবু জীবন শব্দবিহীন পায়ে
ভরে ওঠা সহস্র পল্লবে
তৃণের মত বিশ্বজয়ী হবে।
তারই প্রমাণ দিচ্ছে এ মাঠ জুড়ে
মাইক থেকে শূন্যে ছুঁড়ে ছুঁড়ে
গানের বুলেট, সুরের চিহ্ন ছাড়া
কালীমায়ীর পূজার দাপে
কাঁপিয়ে দিয়ে পাড়া।
যেমন করে ঘরের পাশের
গর্ত ও নর্দমা
ঝেঁটিয়ে ফেলা আবর্জনার
স্তূপ হয়েছে জমা
সরিয়ে নেবার নাই কোনো উদ্যম
সদ্য শক্তি মহামারির বাড়াচ্ছে বিক্রম
তেমনি করে যুগান্তরের
সঞ্চিত জঞ্জাল
লরি চড়ে নৃত্য করে বাজিয়ে কর্তাল।
কতদিনের বিড়ম্বনা নিরর্থকের ভার
কত মৃত্যু যার কোনোদিন
হল না সৎকার

তারি বোঝায় ন্যুব্জে পড়া কাঁধ
তবু জাগে নূতন নূতন সাধ।
আত্মিকালের অসাধ্য তাই
এই আধুনিক পূজা
করাল বদন নেই এখানে
নেই কো দশভূজা
সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ধুম
জনসভায় উচ্চভাবের একান্ত মরশুম।
আঁশ ছড়ানো পাঁশ গাদাতে
ডাক দিয়েছি দেশ বিদেশের লোক
তাদের কত দুঃখ আছে
তা নিয়ে আজ ঠিক জানাব শোক।
মাঝে মাঝে ছাড়ব উপদেশ
বিশ্বপ্রেমে ভরা আমার দেশ।
শ্রোতার মধ্যে দুশ চারশ শিশু আছে বসে
পায়ে রিকেট, ছিন্ন বসন
পাঁজর গেছে ধ্বসে।
ঐ মাঠেরই ক্ষেতে ছিল
গজিয়ে ওঠা তৃণ
তারাও এমন শীর্ণ খিন্ন
হয়নি কোনো দিনও
অন্ন তো আর ভাঁড়ারে নেই
আছে কিন্তু শখ
প্রথম রকেট তার পরে
ঠিক ওড়াব ভস্টক।

বিবেকানন্দ ও আমি

সত্যসন্ধ পরম মানব
তোমাকে আপন বলি
এ স্পর্ধা হল না অসম্ভব।
আজ সেই অকুণ্ঠ ঘোষণা
অনায়াসে সহ্য হল,
কান পেতে রোজ গেল শোনা।

তুমি নেতা ছিলে
আর আমিও নায়ক
তোমার অমিত তেজে
ত্যাগের পাবক।
ঊর্ধ্বমুখে জ্বলেছিল,
সেখানে নিঃশেষে হল ছাই
কত স্বার্থ, কত লোভ, কত ক্ষুদ্রতাই।
কম্বুকণ্ঠে উদ্‌ঘোষিত পরম আহ্বান
পতিতের দুঃখিতের চির জয়গান
পঙ্কশয্যা হতে উঠে প্রাণস্পন্দ বেগে
তোমার পবিত্র স্পর্শে মৃত্যু হতে জেগে
নর যারা হল নরোত্তম।

এ সত্য পরম
আমিও তো জানি।
বইয়ে বাঁধা তোমার যে বাণী
সে আমার মুখে মুখে গীত
অসংখ্য মানুষ শুনে হয়েছে স্তম্ভিত।

তুমি গুরু ছিলে আর আমিও তো নেতা
শতবক্র পাক দেওয়া কত ভোটে জেতা।
তোমার সেবার মন্ত্রে
আমিও তো করিব সেবাই
তাহারি উদগ্রলোভে
মাঝে মাঝে শত্রুকে নেবাই
নিন্দা আর কলঙ্কের গ্লানি দিয়ে তাকে
পথের কণ্টক তুলে
দৃঢ় করি সেবা অভীপ্সাকে।

আমারও প্রতিজ্ঞা রবে স্থির অচঞ্চল
স্বার্থে স্বার্থে গিঁঠ দিয়ে বাঁধি তাই মানুষের দল।
টানে তারা মধ্য আকর্ষণে
গরল মন্থিত করে আর্তদেহে মনে।
তোমার বীর্যের বাণী
আমারেও করে তোলে বলী
গেঁথে আনি পূজার অঞ্জলি।
মর্মর মন্দির ছায়া সাজান সভায়
পরি বসে সুরভি চন্দন
তোমার বন্দনে মেশে আমার বন্দন।
সম্মুখে চঞ্চল দেখি মানব সাগরে
আমার অগণ্যভক্ত বন্দরে নগরে।
তোমারেও ভালোবাসে আমারও তো একান্ত স্বকীয়
তোমারি বাণীর মন্ত্রে ইহাদের করেছি আত্মীয়
দিয়েছে আমারে শ্রদ্ধা অমেয় বিশ্বাস
এদেরই বাহুর বলে শক্তি ভরা আমার নিঃশ্বাস।

দারিদ্র্য যে নারায়ণ সে মন্ত্রের জোরে
অন্নহীনে বস্ত্রহীনে রাখি শান্ত করে।
বঞ্চিতের উষ্ণশ্বাস
প্রতপ্ত বিলাপ
ওঠে না সে উচ্চ হর্মে
নিয়ন্ত্রিত যেথা শীততাপ।

হে বীর হে বীর্যবান হে আদর্শ নর
তোমারেই করেছি তো একান্ত নির্ভর
তবু মাঝে মাঝে মোর শশীহারা রাতে
কখনো প্রদোষে আর কখনো প্রভাতে
কি অজ্ঞাত ত্রুটি
তোমার ললাটে যেন ঘনায় ভ্রূকুটি
ভীত পরাজিত মনে কিসের সন্তাপ
পাবকে স্পর্শিত হয় পাপ
তারই দিব্য ব্যোম স্পর্শ দাহ
গলান আগ্নেয়গিরি মৃত্যুর প্রবাহ
চমকিত দামিনীর বহ্নির মতন
জ্বলে তব তৃতীয় নয়ন।

ক্ষণে ক্ষণে জানি
তোমার শরিক নয় আমি শুধু প্রাণী
আমি শুধু অকিঞ্চন নর
নরোত্তম হতে সাধ ভিক্ষা চেয়ে
ফিরেছি সে বর।

১৯৬৩

মহামানবকে

তোমাকে বন্দনা করতে শক্তি দাও
প্রবঞ্চিত বন্দী আমার আত্মা
তাকে শোনাও
সেই বার্তা, সেই গান
নিঃসংশয় অমোঘ আহ্বান
যে গানে নন্দিতা
উজ্জীবিত হল নিবেদিতা।

জানি আমি ছোট ছোট বীজ
রয়েছে আলোর প্রত্যাশায়
মাটির বন্ধন খুলে
উদ্ঘারিত করে দিতে চায়
স্বর্গমুখী প্রাণের স্পন্দনে।
জড়ত্বের অসংখ্য বন্ধনে
বন্দী হয়ে দিয়েছি বিকায়ে
আকাঙ্খা জর্জর সত্তা
স্বকল্পিত দায়ে।
আমি খিন্ন পরিক্লিন্ন
তবু মোর ক্রন্দিত পিপাসা
উর্ধ্বোত্থিত এক স্বপ্ন, একটি প্রত্যাশা
তোমাদের চোখে রেখে চোখে
দেখে নেব একবার ভূর্ভুব এই স্বর্লোক

মর্ত্য আর দিবি
নক্ষত্রখচিত স্বর্গ আশ্চর্য পৃথিবী

দুইএ মিলে কোন অভিপ্রায়ে
বারে বারে দিয়েছে পাঠায়ে
যে পূর্ণ মানবরূপ
তোমাদের বিগ্রহে সম্ভব
তাহারি সে অমেয় গৌরব
একবার লেগে প্রাণ মূলে
অজ্ঞাত যে সম্ভাবনা—দিক তার লৌহ দ্বার খুলে
স্বর্গমুখী সুখ
চৈতন্যের কেন্দ্র হতে একবার ভরিয়া তুলুক
আমার কর্মের পাত্র
সত্য হোক জীবনের রতি
জ্যোতিষ্কের মহাঙ্গনে
মুহূর্তের প্রাণের আরতি।

কোলাহলে আবর্তিত
জনতার উদ্বেগে মুখর
উৎক্ষিপ্ত হতেছে ঊর্ধ্বে প্রাণঘাতী স্বর-
লেগেছে কুটিল দ্বন্দ্ব
স্বার্থে স্বার্থে চলেছে দ্বৈরথ
শানিত সঙ্গীন তুলে শত শত মত
তোমার আমার এই আত্মার ভিতরে
বিষ বাষ্প ঘনীভূত করে।
দেখি না ভাইএর মুখ
বন্ধু হল ক্রুর
তীক্ষ্ম মুখ অবিশ্বাস
তাহারি নিষ্ঠুর
ছায়া পড়ে আতঙ্কিত মনে
আমার এ মৃত্যুনীল প্রাণের গহনে।
এ মৃত্যু যে অপমৃত্যু
পরিণতি নয়
উদ্ভিন্ন নূতন বীজে
রেখে যাওয়া শাশ্বত সঞ্চয়
ঈর্ষায় মন্থিত হয়ে এ মৃত্যুর ধারা
ইতিহাসে বার বার এনেছে সাহারা
মরুত্তাপে বিশুষ্ক দৃষ্টিতে।
তবু প্রেম বারে বারে নূতন সৃষ্টিতে
নূতন প্রাণের বাণী আনে সমুৎসুক
তোমার আমার মাঝে
মেলে দিয়ে চির উষ্ণ সুখ—

হে মানুষ তুমি তাই অনন্ত অশেষ
তোমার সত্যের মাঝে
অপাবৃণু আমার স্বদেশ
যে কখনো যায়নি হারায়ে—
লুব্ধ মনে সে সত্যের সীমানা পারায়ে—
স্বার্থে যার শেষ নয়
যে পরার্থ প্রাণের সম্মান
এ দেশের ইতিবৃত্তে রেখে গেছে স্থির অভিজ্ঞান

উচ্চারিত ঋক্ মন্ত্রে
ঊষার আহ্বানে
প্রথম জ্ঞানের যজ্ঞে
যে কবির প্রাণে—
অনন্ত এ জ্যোতির্লোক
মর্ত্য আর দিবি—
যাঁদের আনন্দে হল
নন্দিত পৃথিবী
আমার প্রাণের কেন্দ্রে
যেথা তার চিহ্ন অবশেষ
ধূলার গুণ্ঠন খুলে
দেখাও সে আমার স্বদেশ।

কর্তব্যে নিশ্চল হয়ে
গাণ্ডীবে যে দিয়েছে টঙ্কার
বীর্যের ইন্ধনে জ্বলে স্থির প্রতিজ্ঞার
কিণাঙ্কিত বাহুমূলে শক্তির আগুন
প্রজ্ঞা প্রেমে একত্রিত জয়ী কৃষ্ণার্জুন।

অসূয়া নিয়েছে মুছে সমুত্থিত শক্তিশৈল হতে—
আবার তাদের মূর্তি দেখাও এ উদ্‌ভ্রান্ত জগতে।
ব্রতবদ্ধ আচারের একান্ত অধীন
তবুও আপন সত্য বেচে নাই যারা কোনোদিন
লোভে যারা অস্পর্শিত
দারিদ্র্যে যে ধৃত স্থিত মন
অচল যে ধর্মাসনে
তপস্যায় বসেছে ব্রাহ্মণ—
তাহাদের চিত্তদীপে আর একবার
আলো কি জ্বালাতে পার স্বদেশে আমার ?

ভ্রমের কণ্টক তুলে ছিন্ন করে নিরর্থ সংস্কার
মানবের চির মূল্য যে বিপ্লবী করেছে উদ্ধার
করুণার প্রেমস্নাত কল্যাণের ব্রত—
উচ্চারিত বিশ্বপ্রেমে প্রেমী তথাগত।
তাঁহাদের প্রাণ-স্পর্শে শুদ্ধ অমলিন
প্রেমের পরম জ্যোতি ফেলে নাই ছায়া কোনো দিন
আজ তাঁরা পরিত্যক্ত তাঁহাদের বাণী পরাভূত
লোভের পঙ্কিল জলে আবিল যে ধর্ম পরিশ্রুত।
সভ্যতার শূলে বেঁধা শুধু এক শূন্য হাহাকার—
শত স্বার্থে মেলে জাল যুধ্যমান করেছে সংসার।
শত্রুর বিষাক্ত শর কত ছদ্মবেশে—
হেনেছে যে অস্ত্রাঘাত অসতর্ক প্রাণমূলে এসে—
তারে ভস্ম করে দেবে সে পাবক নিবায়ে ব্রাহ্মণ
ভুলে গেছ প্রতিজ্ঞার নিঃস্বার্থ সাধন—
ফন্দীর জটিল জালে মৃত্যু তিক্ত স্বাদ
লোভের গহ্বরে বদ্ধ অশুদ্ধ এ ব্যর্থ আর্তনাদ—

শুধু আশা এরই নিচে খনির ভিতর
একদিন অকস্মাৎ জন্ম নেবে পরশ পাথর
প্রজ্ঞার মুখোশ পরা মূঢ়ের ছলনা
খুলে যাবে স্পর্শে তার, মেলে স্বর্ণ কণা
জ্যোতির্ময় ঊর্ধ্বগতি সত্যের উন্মেষ
মৃত্যুর সীমান্তে এসে দেখে যাব এ অমর্ত্য দেশ